চেনা অচেনায় মেশা

শাশ্বতী রায়

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Mrs Saswati Ray 2025

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRoseONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7310-122-4

Cover design: Yash Singhal

First Edition: October 2025

সূচীপত্র

অমৃতেরপথে 1
পূজারিণী.. 18
স্বপ্নতরণী.. 26
নিঠুর চরণ পদ্মে.. 47
অপরাহ্ন কথা.. 63
আবছায়া অতীত 78
আঁধারের শপথ.. 92
আজকের যশোদা.. 109
সেদিনের কথা 124
আগামী 135

অমৃতেরপথে

_______________ গ্রীষ্মের শুরু। তবুও, বসন্তের পরশ লেগে আছে নতুন বছরের ঠোঁটের কোণায়।

-" আমি এসে গেছি ছন্দক।"

-" আমি ও আপনার অশ্বশকট, উভয়েই প্রস্তুত যুবরাজ। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে, আমি আমাদের আজকের যাত্রার কথা সবার কাছে অশ্রুত রেখেছি। কিন্তু, মহারাজ জানতে পারলে, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে যে কুমার।"

-"হবে না।আর, যদি বা হয়, মহান উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়ে, এটুকু সহ্য করতে পারবে না!? ইতিহাস তোমায় যুগ যুগ ধরে স্মরণে রাখবে। আমি বলছি। বিশ্বাস না হয় লিপিবদ্ধ করে রাখো।"

-"আপনার আদেশ শিরোধার্য। রথে পদার্পণ করুন কুমার। উদ্দীপ্ত ভবিষ্যৎ আপনার প্রতীক্ষা করছে।"

রথ চললো এগিয়ে তার আপন ছন্দে ভবিষ্যতের দিশায়।

"অপরাধ মার্জনা করবেন কুমার, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, হঠাৎআপনার নগর পরিভ্রমণের বাসনা জাগলো কেন ? নগর ভ্রমণে এর আগে তো কখনো বাহির হননি। তবে আজ হঠাৎ!

-"আগে কখনো বাহির হই নি, কারন, পিতার নির্দেশ তথা রাজ-আদেশ।কুলগুরুর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারি। সেই ভয় থেকে পিতা তথা রাজা শুদ্ধোদন, আমাকে প্রাসাদ বন্দী করে রেখেছেন এ তাবৎকাল পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়েছেন সংসারে আবদ্ধ করবার মানসে, মায়ার বন্ধনে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে। তাই এর আগে আর বাহির হওয়া হয় নি। আমার পুত্র রাহুল হলো সেই মায়া মোহ বন্ধনের শেষগ্রন্থি স্বরূপ।"

-"তাহলে আজ, কুমার কি এমন ঘটনা ঘটলো, যে আপনি এতো উতলা হলেন নগর ভ্রমনে বাহিরহবার জন্য!"

-"ছন্দক, শুধু আজ নয়, কয়েক দিন যাবৎ,আমি যেন কার আহ্বান শুনতে পাচ্ছি মনে মনে। রাতে ভালো করে নিদ্রা যেতে পারছি না। প্রাকারে দাঁড়ালে, দেখছি, বড় বড় বৃক্ষরাজি শীর্ষ আন্দোলন ক'রে আমায় যেন ডাকছে ইশারায়। বলছে, আয় আয়, পুত্র মোর, এ বিশ্বনিখিল যে তোর সান্নিধ্য পেতে চায়- আমি যেন একবার এই পৃথিবীর ভাষা-কথা- ইঙ্গিত শুনি, বুঝি, এই ধরিত্রী মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তার কষ্ট লাঘব করি। মনের মধ্যে এই ভাবের উথাল- পাথালে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি ছন্দক। একবার আমায় ওই দূরের নগর পথে নিয়ে চলো। আমি শুনতে চাই,বুঝতে চাই,জানতে চাই আমার নগরবাসীর অন্তরের কথা, কি এমন বার্তা জানানোর জন্যে আমায় এই বৃক্ষরাজি ইশারায় ডাকছে! কি আছে ওই নগর জীবনে আমার জন্য অপেক্ষা করে! "

-"বুঝেছি কুমার, আপনার ভাগ্যদেবী আপনাকে ইশারায় ডাকছে,যাঁর ডাককে, উপেক্ষা করা, কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সেই ভবিষ্যতই আপনার অপেক্ষায়।" -"এখন সময় কত হলো বলো তো ছন্দক ? নগরে উপনীত হবার পূর্বেই সকাল হয়ে যাবে তো ? নয়তো, নগরের সমস্ত কিছুকে আর সবাইকে ভালো ক'রে দেখবো কি করে? জানবো কি করে, চিনব কি করে? "

-"অবশ্যই কুমার, নগরে প্রবেশের সময় সকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। এখনই তো ভোর হয়ে এলো প্রায়। আমরা যখন নগরে পৌঁছবো, তখন, ঊষার শেষ কিরণের ছবটায় কুয়াশার চাদর সরে গিয়ে, স্পষ্ট হবে নগরের জনজীবন উচ্চকিত স্বরে, ঝলমলে আলোয়। আমি আপনাকে, সারাদিন ভ্রমণের পর, সন্ধ্যার অন্ধকারে, ফিরিয়ে আনবো রাজপ্রাসাদের অলিন্দে। কেউ জানবে না, আপনি নগর-ভ্রমনে গিয়েছিলেন।"

-"উত্তম ব্যবস্থা ছন্দক। তুমি পথে যেতে যেতে, ততক্ষন, আমাকে নগর ও নগর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত কর।"

-"আপনার নগর খুব সুন্দর করে সাজানো কুমার। এই নগরে মন্দির আছে,উদ্যান আছে, নদী আছে, পাহাড়ের সৌন্দর্য্য আছে। এখানে পাহাড়ের উপত্যকায়, পশুচরে, পাহাড়ের ঢালে ঢালে চাষ-আবাদ হয়। নগরে সব্জি বিপণি আছে, যেখানে বাজার বসে, হাট বসে, লোকজন কেনা-কাটা করে।নদীতে, ঝর্ণায়, মানুষ স্নান সম্পাদন করতে আসে, মহিলারা গান গেয়ে ফসল তোলে, কাপড় বোনে। নগরের শিশুরা খেলা করে,

বাঁশিতে সুর তোলে, বাবা-মাকে হাতে হাতে কাজ করে দিয়ে সাহায্য করে, বণিকের দল রকমারী সম্ভারের ব্যবসাপত্র চালনা করে, কুমার -কুমারীরা বিবাহে, অনুষ্ঠানে আনন্দ ফূর্তি করে, নাচ-গান করে, মাদকের নেশা করে, নেশার ঘোরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতে, আবার, নেশা তিরোহিত হলে,ভালোবেসে হাসি মুখে দিন কাটায়। ঘন ঘন হর্ম্যরাজি আর বিপণন ক্ষেত্রের জন সমাগমে, নগরের পথঘাট সব সময় কোলাহলে পরিপূর্ণ, ও সদাই আনন্দে উচ্ছ্বলিত থাকে। নিস্তব্ধতার কোন স্থান নেই এই নগর জীবনে।"

-"কেমন সে জীবন, নিজের চোখে দেখার জন্য আমি উদগ্রীব, ছন্দক। নগরের মানুষ কেমন, তাদের বাক্যালাপ, চলাফেরা, কলহ, সংঘাত, নৃত্যগীত, খেলাধুলা, একসাথে ওঠাবসা আর বাঁচার নিয়ম কেমন সারথি? আমাদের রাজপ্রাসাদের জীবনের থেকে সম্পূর্ণই কি আলাদা ?"

-"অবশ্যই কুমার, অনেকটাই ভিন্ন। অনেকখানিই আলাদা। নগরের মানুষ নির্ভীক। মন খুলে হাসে, প্রাণ খুলে গান গায়,গলা খুলে কলহ করে, কটূকাটব্য করে, বিপণন স্থলে জিনিসপত্রের দর করতে গিয়ে দ্বৈরথে পর্যন্ত মত্ত হয়। শরীর অসুস্থ হলে, বৈদ্য-কবিরাজের কাছে গিয়ে, ঔষধ নিয়ে আসে। কবিরাজকে ডেকে পাঠায় না। ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিজেদের হাতে স্নান করিয়ে,খাইয়ে দিয়ে, গান করে ঘুম পাড়ায়। আবার, অশিষ্ট আচরণ করলে কঠিন শাস্তি দেয়। নিজের চোখেই সব দেখবেন কুমার। চলুন।"

-"দেখো ঊষার আলোয় লাল আকাশ, পাহাড়ের ঢালে কি অপূর্ব লাগছে ! বৃক্ষরাজির ইশারা, নিরিবিলি অলি গুঞ্জরিত পথে পাতাদের অস্‌ফুট শিস্‌ ধ্বনি, পাখিদের ডানায় চঞ্চলতা, নিস্তব্ধতার আড়ালে জোনাকির আলোয় মায়ার খেলা – এসব বোধহয় নেই নগর জীবনে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে- সেখানে আছে ভরপুর উল্লাস, জীবন ভরা প্রেমের, প্রাণ ভরা আনন্দের আর হৃদয় ভরা স্‌ফূর্তির অনেক উপচার- সানন্দে বেঁচে থাকার প্রচুর রসদ।"

-"এটা ঠিকই অনুমান করেছেন কুমার। প্রকৃতির আহ্বান নগরের জীবনে শোনা যায় না সেইভাবে। আসলে, সবাই যে যার কর্মে ব্যস্ত। কারোর এতটুকু সময়ই নেই প্রকৃতির কথা শোনার, বোঝার, অনুভব করবার। ঐ যে দেখুন, মন্দিরে চলেছেন পুরোহিত মহাশয়, দ্রুতবেগে, পূজার্চনার সময় অতিক্রান্ত প্রায়, তাই। কৃষক গাভী নিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঢালে কৃষিকাজ করতে- ঐ যে মহিলারা যাচ্ছেন ঝর্নার জল আনতে নিকটস্থ কাননে- কারোর সময় নেই সূর্যের শোভা দেখার, বিটপীদলের কথা শোনার, আকাশের গানে কান পাতার। সবাই ব্যস্ত যে যার কর্মশৃঙ্খলে।"

-"যথার্থই বলেছো ছন্দক। নগরে সকলেই জঙ্গম, এখানে স্থবিরতার চিহ্নমাত্র নেই। তবে উপস্থিত আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। কিঞ্চিৎ আহার্যের ব্যবস্থা করো, ঐ যে বিপণিতে সুভোজ্য খাদ্য সুসজ্জিত আছে, ওগুলো আহার করা যাবে না? "

-"অবশ্যই যাবে কুমার। আমি রথ থামিয়ে এখনি যাচ্ছি ওই বিপণন স্থলে।"

-" রাজকুমার, আমি ধন্য। আমার বিক্রয়ার্থ মিষ্টান্নভোগ আপনার চরণে অর্পণ করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ, গ্রহন করে কৃতার্থ করুন রাজন।"

-"কি নাম আপনার ?"

-"আজ্ঞে, সুরথ। আমি আজ প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ এই মিষ্টান্ন বিপণন করছি । প্রভু, আপনাদের দাক্ষিণ্যে, আমার মিষ্টান্নের বাণিজ্য ভালোই নির্বাহ হচ্ছে। মহারাজের কৃপায় পরম কুশলে আছি।"

-"হুম, মিষ্টান্ন অতি সুস্বাদু। ছন্দক, এনাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে, রথ নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও। "

-" জয়, রাজকুমারের জয়, জয় কপিলাবাস্তুর ভাবী রাজাধিরাজের জয়।" সুরথের কন্ঠে রাজকুমার সিদ্ধার্থের জয়গান গীত হল।

-"ওই যে দেখুন কুমার, সামনে নগরের রাজপথ। পাহাড়ী বাঁক এর পথ শেষ। এবার নগরের শুরু। ওই যে নগরের তোরণ। ওর অগ্রবর্তী পথ দিয়েই এবার আমরা অগ্রসর হবো।"

-" সূর্যের তাপ বাড়ছে। রথ দ্রুত চালনা করো ছন্দক। আরে, ওটা কি ? একটা ঘরের সামনে অতগুলো বালক কি করছে ?"

-"ওটা বিদ্যালয়ের ভবন কুমার। এখানে নগরের ছেলে-মেয়েরা এসে বিদ্যা শিক্ষা করে - শাস্ত্রতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ

করে ওদের গুরুদেবের কাছে। ঐ যে দেখুন, দূরে ওদের গুরুদেব ওদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। মহর্ষি গুরুদেবের পরিধানে রয়েছে দেখুন সিতবস্ত্র ও উত্তরীয়, শিরে প্রলম্বিত পলিত কেশ ও শ্মশ্রুমন্ডিত আননে প্রসন্ন সহাস। দেখুন আপনার সম্মানার্থে রথের উদ্দেশ্যে গুরুদেব অভিবাদন জানাচ্ছেন। দেখুন, শিশুসকল কেমন, "রাজকুমার, রাজকুমার" রবে হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। করতালি আর হাসি দিয়ে আপনাকে অভিনন্দিত করছে ওরা। আপনিও কুমার ওদের প্রীতি সম্ভাষণ জানান। এটাই আমাদের রাজ্যের রীতি।"

-"তাই তো দেখছি, সবাই কত উল্লসিত আর আনন্দিত আমাকে দেখে ! তার মানে, প্রজারা সবাই আমায় চেনে, জানে আর ভালোবাসে"।

-"অবশ্যই কুমার।"

শিশুদের বার্তার প্রত্যুত্তরে কর সঞ্চালন ক'রে কুমার রথ নিয়ে অগ্রসর হলেন।

-"চলুন কুমার, সামনে দেখি।" বলল ছন্দক।

-"ঢং ঢং আওয়াজে মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে,পূজানুষ্ঠান চলছে বলে অনুমান হচ্ছে। নর- নারীরা স্নানান্তে সুসজ্জিত -সুসজ্জিতা হয়ে পুষ্প পাত্র হাতে নিয়ে চলেছে মন্দিরের উদ্দেশ্যে। কি অপূর্ব লাগছে এসব দেখতে ছন্দক! আমি আগে কেন আসিনি এই পথে? এদের মাঝে? "

-"দেখুন কুমার, বিপণি বিতান এসে গেছে। সারি দিয়ে পসরা সাজিয়ে উপবিষ্ট কত মানুষ, আর কত মানুষ ক্রয়

করছে ঐসব পসরা। কেউ বস্ত্র কিনতে ব্যস্ত, কেউ ফল কিনতে ব্যস্ত, কেউ বা ব্যস্ত সব্জি কিনতে,কেউ ফুল কিনতে আবার কেউ মিষ্টি, কেউ রকমারী জিনিস যার যা পছন্দ ক্রয় করছে। কারোর দিকে কারো তাকানোর অবসর নেই।"

-"ওরা আমাদের রথের দিকে আসছে কেন ছন্দক ? পাত্রে পুষ্প আর ফল নিয়ে-কি সুন্দর পুষ্প! আর কি সুমিষ্ট দেখতে ফলগুলো। আমার দিকে ওরা হাসি মুখে এগিয়ে আসছে কেন ?"

-"ওরা আপনাকে ঐ পুষ্প , ফল আর মিষ্টান্ন উপহার হিসেবে দিতে চায় কুমার। ওগুলো গ্রহন করে আপনার প্রজাবর্গকে খুশি করুন প্রভু ।"

-"সত্যি আমি অভিভূত ! ভাবতেই পারছিনা, এরা সবাই আমাকে এতো ভালোবাসে! আমি এতোদিন কেন আসিনি এদের কাছে ?"

-"কুমার, ওদের কর সঞ্চালন করে আপনার ভালোবাসা জ্ঞাপন করুন। ওরা খুশি হবে।"

-" আরে, উনি কে ? এতো মানুষের ভিড়ে, শুভ্র কেশ, হাতে লাঠিটা শক্তকরে ধরা, ছিন্ন কন্থা গায়ে, শির সতত কম্পমান, স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারছেন না পর্যন্ত -তবুও এসেছেন হাসিমুখে আমাকে দেখতে, উনি কে ? ওনার কি হয়েছে ছন্দক ?"

-"উনি বৃদ্ধ। ওনার বয়স বৃদ্ধি হয়েছে, তাই উনি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।সবারই বয়স বৃদ্ধি হলে, শারীরিক শক্তি, ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়, জরার প্রভাবে চলার ক্ষমতা চলে

যায়। তখন, লাঠিকে ভর করে চলতে হয়। ওনাকেও তাই এভাবে চলতে হচ্ছে। জরার কারণে, মানুষ যখন কাজ করতে পারে না, তখন, স্বাভাবিকভাবেই অর্থ রোজগার করতে অক্ষম হয়, দারিদ্র্য নেমে আসে জীবনে। তাই, ছিন্নবস্ত্র সম্বল করেই চলতে হয়, কুমার।"

-"সবার জীবনেই জরা আসে বয়স বাড়লে ! ছন্দক, আমার জীবনেও আসবে ? আমিও এরকম হয়ে যাবো ?" –

"কুমার আপনি সম্ভ্রান্ত রাজা, আপনার জীবনে দারিদ্র্য আসবে না হয়তো, তবে, জরা সব মানুষের জন্য অনিবার্য নিয়তি। এ কি কুমার, আপনি এভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন কেন, বার্ধক্য তো প্রকৃতির নিয়ম। একে কখনই এড়ানো যায় না। চলুন, আগে দেখি।"

ঘোড়ার সাথে রথ চললো এগিয়ে। শাক্য কুমার তখনো বিমর্ষ। হঠাৎ কুমারের সম্বিৎ ফিরল একটি বালকের কণ্ঠস্বরে।

কুমার দেখলেন -"রাজকুমারের জয় হোক" বলে একটা ছোট্ট বালক তার বৃদ্ধা ন্যুব্জা পিতামহীর হাত ধরে এগিয়ে এল।

"কুমার আমি আমার ঠাকুমাকে রথ ও রাজকুমার দেখাতে এনেছি" বালক বলে উঠল। বৃদ্ধার সস্নেহ দৃষ্টি ও হাসি সিদ্ধার্থের সব কষ্ট ভুলিয়ে দিল যেন। কুমার বুঝলেন, ভালোবাসাই একমাত্র পথ, সব কষ্টকে জয় করার।

রথ চললো এগিয়ে।

-"ছন্দক, ওই তরুতলে, কে শুয়ে আছে এই অসময়ে ? কেন ?"

-"ও ব্যাধিগ্রস্ত কুমার। দুরারোগ্য কাল ব্যাধিতে ও আক্রান্ত। তাই ওর পরিবারের লোকেরা ওর সংস্রব ত্যাগ করে, ওকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে, বৃক্ষতলে ফেলে গেছে। ওর সন্নিকটে কেউ যাচ্ছে না, কারন স্পর্শ লেগে, তাদেরও অসুস্থতা আক্রমণ করতে পারে। তাই সভয়ে সবাই শতহস্ত দূরে রয়েছে ওর থেকে। আপনিও ওর কাছে যাবেন না কুমার।মৃত্যুই এখন ওর একমাত্র ভরসা।"

-"মৃত্যু কি ? ও অসুস্থ কেন? রোগ কি? আমায় বুঝিয়ে বলো ছন্দক।"

-"শরীরের ওপর অনিয়ম ও অত্যাচার করলে রোগ আসে, মানুষ অসুস্থ হয়। লোভজনিত পাপের ফল রোগ ও অসুস্থতা। যদি সেই রোগের আরোগ্য সম্ভব, তো চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা হয়, আর, যদি ছোঁয়াচে দুরারোগ্য হয়, চিকিৎসা সম্ভব না হয়, তো ভগবানের উদ্দেশ্যে তাকে ফেলে রাখা হয়, মৃত্যু তে যাতে সেই ব্যক্তি শান্তি পায়।"

-"ছন্দক, বললে না তো মৃত্যু কি ? শান্তি কি? আমার ভিতরে এসব জানার জন্য ভীষন আলোড়ন উত্থিত হচ্ছে।"

রথ চলছে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে।

-"মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি কুমার। জীবনের সব দুঃখ, কষ্টের অবসান। সব সম্পর্কের মায়া মোহ বন্ধনের ছিন্ন

ভিন্ন অদৃশ্য অবস্থা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রান ও আত্মা জীবনের জড়তা থেকে, রোগ ভোগ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। আবার যখন আত্মা নতুন দেহে জন্ম নেয়, তখন থেকে শুরু হয় নতুন জীবন চক্র, নতুন জীবনযন্ত্রণা। একে, পুনর্জীবন চক্র বলে। এভাবেই পৃথিবী চলছে। আপনিও শাক্যকুমার, রাজকুমার রূপে জন্মের আগে, অনেক বার জন্মেছেন। নতুন জন্মে, কারোর আর, পূর্ব জন্মের কথা মনে থাকে না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। "

-"এসব শুনে, আমার নিজের জীবন নিয়ে খুব চিন্তা আর ভয় হচ্ছে ছন্দক। সেই সাথে আরো আরো প্রশ্ন জাগছে মনে। যদি, বার বার মানুষকে জন্মাতে হয়, তো, তাহলে মানুষকে বার বার শুধু কষ্টই পেয়ে যেতে হয়? এই কষ্ট থেকে আত্মার মুক্তি কিভাবে সম্ভব ?”

"তা জানিনা কুমার। আমি এক অশিক্ষিত সাধারণ গরীব প্রজা। আমি কি করে জানবো যে আত্মার কষ্ট মুক্তি, চিরতরে কিভাবে সম্ভব ? আমি শুধু জানি, বিধাতার নির্দেশকে, মেনে নিতেই হয়, হবে।"

-"ওখানে কি হচ্ছে ছন্দক ? বেশ কিছু লোক শ্বেত বস্ত্র নিয়ে কি সব করছে, কিছু লোক একত্র হয়েছে। ওই একজন মহিলা আর একটি শিশু চিৎকার করে কাঁদছে, কেন ? ওই লোকটিকে সাদা কাপড়ে ঢেকে শায়িত করে, কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে - কোথায়? এসব কি হচ্ছে ?"

-"কুমার, যাকে সাদা কাপড়ে বেঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সে মারা গেছে। মৃত্যু তাকে জীবন থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তাই, তার আত্মা বিহীন শবদেহ, অন্যান্যরা তুলে

নিয়ে যাচ্ছে আগুনে পুড়িয়ে, দাহ করে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে। পিছনের মহিলা ও শিশুটি ঐ ব্যক্তিটিকে আর কোনদিন জীবিত দেখতে পাবেনা বলে কাঁদছে। কুমার এটাই মৃত্যু ও তার করুণ রূপ।"

কুমারের দু-চোখ থেকে, অঝোরে বারিধারা নেমে এলো দেখে, ছন্দক,কুমারের মন প্রফুল্ল করতে উদ্যোগী হয়ে,গেয়ে উঠলো -" বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...." ।

রথ চললো এগিয়ে।

গান শেষ হতে, রথ এসে দাঁড়ালো এক নদীর ধারে।

-"কুমার, এই নদীর জলে হাত-পা ধুয়ে ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন বৃক্ষতলে। আমি দেখি, আপনার জন্য কিছু ফলাহারের ব্যবস্থা করি।"

কুমার নিশ্চুপে এগিয়ে গেলেন নদীর ধারে। মুখে আর কোনো কথা নেই। শুধু জলের আওয়াজ জোর থেকে জোরে হতে লাগলো।

-"এই নিন কুমার, আপনার দর্শনার্থীদের দেওয়া কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আহার করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করুন।"

-"তুমিও কিছু ফল নাও ছন্দক।" এই প্রথম, এতক্ষণ পর, কুমার কথা বললেন।

-"ছন্দক, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে, জলপান করছেন, ওই অদ্‌ভুত বেশধারী মানুষটি কে ? ও কি করে ?"

-" কুমার উনি সন্ন্যাসী, যোগী, ঋষি পুরুষ। মুন্ডিত মস্তকে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে উনি জগৎ-সংসার কে ত্যাগ করেছেন। নিজেকে উৎসর্গ করেছেন

ভগবানের সাধনায়। মানুষের সেবায়। ওনার সাথে আলাপ করবেন প্রভু? ডেকে আনবো ?"

-" হ্যাঁ, ছন্দক, ডাকো ওনাকে।"

-" প্রণাম রাজকুমার। আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম। আমি এই রাজ্যে নবাগত। দুদিন পরেই চলে যাবো অন্য রাজ্যে। এরই মাঝে, আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য।"

-"আপনার শেষ গন্তব্য কোথায় সন্ন্যাসী ?"

সন্ন্যাসী স্মিত হেসে, -"সব রাজার যিনি রাজা তাঁর পায়ে, যেখানে আছে পূর্ণ আনন্দ, অক্ষয় স্বর্গ, সব জীবন যন্ত্রণার মুক্তি।"

"- চেনেন, সেই পথ ?"

-"না রাজন, তবে তার সন্ধানেই পথে বার হয়েছি।"

-"কি পেলেন এই পথে ?"

-" মানুষের ভালোবাসা, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা- যার অনুভূতি ভুলিয়ে দেয় আপন -পর, ভুলিয়ে দেয় প্রিয় বিচ্ছেদের কষ্ট, সব রোগ- শোক- বেদনার যন্ত্রণা, সব ক্ষুধা - তৃষ্ণা - কামনা। নিজেকে নির্ভার লাগে, এক পরম আনন্দে মন সব সময় ভরে থাকে পরম আরাধ্য কে পাবোই - এই আশায়। এতেই জীবনের সার্থকতা, জন্মের সফলতা। "-

"সন্ন্যাসী, আপনার সাথে কথা বলে মনটা ভরে গেলো। আর, আপনার সময় নষ্ট করবো না, ছন্দক, রথ ঘোরাও, অনেকটা পথ ফিরতে হবে, সময় লাগবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেছে।"

-"হ্যাঁ কুমার, চলুন এবার ফেরা যাক।"

-"কেমন লাগলো কুমার আজকের নগর ভ্রমণ ?"

" -"অনেক কিছু জানলাম,যা জানতাম না। ধন্যবাদ ছন্দক। আমাকে, আরো অনেক কিছু জানতে হবে। তার জন্য আমাকে কাল আবার বাহির হতে হবে। তবে, নগরের পথে নয়। এবার বাহিরে যাবো আমি একা, ওই সন্ন্যাসীর মতো, তার পথে। নয়তো, আমার জানা হবে না সেই পথ, যে পথে মানুষের জীবনের, জন্মের সার্থকতা। তুমি আমাকে সাহায্য করো ছন্দক। সন্ন্যাসীর বেশ আমাকে এনে দিয়ে, আমার সাধনায় আমাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দাও।"

-"কি বলছেন কুমার ! মহারাজ একথা জানতে পারলে আমাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। আমি সবাই কে মুখ দেখাবো কি করে?"

-" আমি নিজে পত্র লিখে, তোমার জন্য,সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো, যাতে, তোমায় শাস্তি পেতে না হয়। তুমি আমার আদেশ অমান্য করতে পারো নি, অসহায় ছিলে, তাই তোমার কোন দোষ নেই, সবাই কে তা জানাবো। তুমি শুধু আমায় সন্ন্যাসী বেশ ধারন করিয়ে দেবে আর রাজপ্রাসাদের বাইরে,বনপথে ছেড়ে দেবে।"

দুর্ভাবনায়, চিন্তায়, আশু বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ছন্দক নীরবে কাটিয়ে দিলো সারাটা পথ। তার দুচোখ বেয়ে নেমে চললো জলের ধারা।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে রথ প্রবেশ করে গেল।

“তাহলে, আজকের মত কালকেও আমি ভোরবেলা আসবো, তবে বেড়াতে নয়, চিরতরে সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবো বলে। ছন্দক, তোমার ভরসায় আমি ঘর ছাড়বো, তুমি আমার সন্তানের দেখভালে সাহায্য ক'রো, আমার অসহায় পরিবার, আমার বৃদ্ধ বাবাকে তুমি দেখে রেখো। আমার সন্ন্যাসী বেশ নিয়ে কাল প্রস্তত থেকো ছন্দক।"

-" আপনি আবার ভেবে দেখুন কুমার, আমি আপনার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য, কিন্তু, আপনি আপনার সংসার জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য উচিত কাজ করবেন তো ?"

-"কিছু ত্যাগ না করলে, কিছু পাওয়া যায় না। আমি আমার অসহায় প্রজাদের, জরা ব্যাধি মৃত্যুর কষ্টকর জীবন থেকে উদ্ধারের ও বাঁচার সঠিক পথটা খুঁজে দিতে চাই। প্রজারাও আমার সন্তান, আমার পরিবার। ওদের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য, আমার রাজকীয় জীবন, রাজপরিবারের সুখ ত্যাগের প্রয়োজন অনিবার্য হলে তাই হবে।কাল প্রত্যূষে আবার দেখা হবে। শুভ রাত্রি ছন্দক।"

সেই অমর দিন____________________

- মহাভিনিষ্ক্রমণ।

-"ছন্দক, আমি প্রস্তুত অভিনিষ্ক্রমণে। তুমি প্রস্তুত তো ?"

ছন্দকের গলা ধরে আসছে কান্নায়, তবুও সে বলে--"হ্যাঁ কুমার। এই নিন আপনার সন্ন্যাসী বেশ। তার পূর্বে, আসুন,আমি আপনার মস্তক মুন্ডন করে দি। "

-"দাও। আর এই নাও আমার পিতাকে, এই রাজ্যের অধীশ্বরকে লেখা আমার পত্র, যে পত্রে আমি তোমার

জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করেছি। এটা সাবধানে রাখো আর ফিরে এসে, অবশ্যই রাজাকে দেবে। আর, এই পত্রও রাখো। আমার পুত্র রাহুল, বড় হলে, ওকে এই পত্র দেবে। আমি ওর কাছেও মার্জনা চেয়ে পত্র লিখেছি। আর, কেন এই সিদ্ধান্ত নিলাম, কেন রাজসুখ ছেড়ে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহন করলাম তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। আশা রাখবো, সবাই আমাকে বুঝতে পারবে, ক্ষমা করবে, মেনে নেবে আমার জীবনের এই সিদ্ধান্ত।"

-"মস্তক মুন্ডন শেষ কুমার, সন্ন্যাসীর বেশ কাষায়বস্ত্র পরিধান করুন এবার।"

-"কেন কাঁদছো ছন্দক ? তুমি জানো না, তুমি বুঝতে পারছ না যে, তুমি ইতিহাসের নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিতে যাচ্ছ। যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যতের মানুষ, এর জন্য, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। চোখ মোছ, কেঁদো না প্রিয়।"

-" সন্ন্যাসী বেশে মুন্ডিত মস্তকে আপনাকে সূর্যের মতন তেজস্বী পুরুষ দেখতে লাগছে কুমার।"

-" চলো, সময় নষ্ট করো না। এখনি সবাই জেগে উঠবে।"

-" রাজপথ পার করে ফেলেছি। এরপরেই বনপথের শুরু। ওই দেখা যাচ্ছে, বনগঙ্গা নদী। ওরই পিছনে আছে বনপথ। নদীর ধার দিয়ে চলে যাবেন কুমার। "

-" রথ থামাও তবে। আমি আসি। সবাই ভালো থেকো, সবাইকে দেখে রেখো।"

-" আমি বয়সে বড় হলেও, একবার আপনাকে প্রণাম করতে চাই কুমার। আজ আর বাধা দেবেন না।"

-" একি ছন্দক, বারন করলাম, তাও তুমি কাঁদছো, আমাকে অশ্রু নিয়ে বিদায় দেবে! তাহলে, আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল হবো কি ভাবে? হাসিমুখে বিদায় দাও প্রিয়।"

-" আর কোনদিন কি আমি আপনার ডাক শুনতে পাবো না ? আর কোনদিন কি আপনার সাথে কথা বলতে পারবো না, প্রভু ?"

-"নিশ্চয়ই দেখা হবে, কথা হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম তোমায়। আমি আবার আসবো। এখন বিদায়।"

"বিদায় প্রভু। সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সাধনায় সফল হোন। ভগবান আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। প্রণাম।"

রথের আওয়াজ ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেলো। তখন সমবেত স্বরে বৃন্দ গান ধ্বনিত হল

আসতো মা সদগময়ঃ

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

মৃত্যোর্মামৃতম গময়ঃ

আবিরাবীর্ময়েধী।

পূজারিণী

______________________ সেদিন সে কানন ভূমে সন্ন্যাসী একা যাত্রী। বনবীণায় যেন নিভৃতে ঝঙ্‌কৃত -"কি অদ্‌ভুত এ নীরবতা! আজ থেকে, এই নীরবতাই মানবের কানে কানে শেখাবে বাঁচার মন্ত্র – নির্ধারণ করবে জীবনের মূল লক্ষ্য। চলো তপস্বী, এগিয়ে চলো। সামনে তোমার কঠিন সাধনার পথ। একটু পরেই সূর্য দেখা যাবে আকাশে। পূর্ব গগন এখনই রক্তাভ হতে শুরু করেছে। বৃক্ষরাজির মাথায় মাথায়, কাক- পক্ষীর ডানার অধৈর্য্য শ্রবণে আসছে।"

তপস্বীর অনুচ্চ স্বগতোক্তি - "হে বনদেবতা, হে কাননপতি, আজ থেকে আমি তোমার আশ্রয়ে থেকে,ধন্য হতে এলাম। তুমি দয়া করে, তোমার কোলে আমায় আশ্রয় দাও। ধন্য হোক আমার নর-জীবন, সার্থক হোক আমার তপস্বী জীবন তোমার আশীর্বাদ ও সহায়তায়। প্রণাম তোমায়।"

নদীর জলের কুলু কুলু ধ্বনিতে বনপথ সরব হয়ে উঠলো। যেন, বনদেবতার, আশীর্বচন ঝরে পড়লো সন্ন্যাসীর ওপর।

-"অনেকটাই বনপথ ধরে অভ্যন্তরে চলে এলাম। ঘন অরণ্যে, বৃক্ষের অন্তরালে নদীর জল, দুই একটি পক্ষী, ছোট ছোট শম্বুক প্রানী আর অধিকতর বৃহৎ বনস্পতির

দল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধুই নৈরঞ্জনা নদীর কুলুধ্বনি কানে আসছে। এবার, নদীর জলে স্নান সেরে ওই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় যোগ সাধনায় ব্রতী হতে হবে।"

তপস্বী গেলেন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সম্পন্ন করতে। মূক বনস্থলী যেন মুখর হয়ে উঠল " স্নান সমাপনান্তে, সন্ন্যাসী তথাগত, ফিরে এসেছেন বৃক্ষ তলে। ততক্ষণে, তীক্ষ্ণ তপন তাপে পৃথিবী ঝলসে যেতে শুরু করেছে। তপস্বীর ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। তিনি মন দিলেন যোগ সাধনায়, মনকে, ক্ষুধা কে দমন করে। "ওঁ" ধ্বনিতে মুখরিত হলো বনরাজিনীলা। অনেক ক্ষণ কেটে গেলো। তপস্বীর ক্ষুধা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আর দমন কার্য চলছে মনের উপরে, ক্ষুধার উপরে। ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ঋষি, সাধনায় মন বসাতে পারলেন না।কেটে গেলো, একদিন, দুদিন, তিনদিন। এভাবেই নিজের মনের সাথে, ক্ষুধার সাথে, যুদ্ধ করে কেটে গেলো সাত সাতটি দিন। ধীরে ধীরে শরীর -মন দুর্বল, অবশ হয়ে আসছে। অষ্টম দিনে চলৎশক্তি যেন কে হরণ করে নিলো। তারই মধ্যে, নদী স্নান সেরে, তথাগত, ক্লান্ত, বিফল মনোরথ, শ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে বৃক্ষতলে ফিরে আসতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। দেখলেন অদ্‌ভুত সব মায়া।"

তথাগত দেখলেন- "আরে, *ঐ* বৃক্ষতলে, আমার বসার স্থানে ওটা কি পড়ে আছে ? একটা উশীর বাদ্যযন্ত্র। অদ্‌ভুত! ওই বাদ্যযন্ত্রের তিনটি তারের প্রথম তারটি খুব শক্ত করে বাঁধা, আঙ্গুল ছোঁয়ানোই যাবে না। দ্বিতীয় তারটি, ঠিক-ঠাক বাঁধা। আবার, তৃতীয় তারটি, ভীষন

আলগা করে বাঁধা। আর ওই লোকটি কে? আগে তো দেখি নি। ওই লোকটি ওই বাদ্যযন্ত্রের মধ্যম তার টি, যেটা ঠিক ঠাক বাঁধা, সেই তারটিকেই বাজাচ্ছেন আর কি সুন্দর সুরের মূর্চ্ছনা তুলছেন! কে ওই লোকটি? যেই হোক না কেন, মধ্যম তারটি থেকেই সঠিক সুর বার হচ্ছে, যেটি ঠিক ঠাক বাঁধা আছে।"

তথাগত মনে মনে স্বগতোক্তি করলেন, "অর্থাৎ, যে কোন কার্য, সঠিক ভাবে, সুসম্পন্ন হতে পারে, যদি, তা, মধ্যম তারের মতোন, মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে সম্পাদন করা হয়। প্রথম তারের মতন কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ সাফল্য লাভের পথ নয়, আবার, তৃতীয় তারটির মতন ভোগ বিলাসে মত্ত আলগা করে বাঁধা, জীবন পথেও সাফল্য আসে না। "মঝঝিম্- পন্থা"ই জীবন সাধনায় সাফল্যের পথ। আরে! ওই লোকটি কোথায় গেল, আর ওই বাদ্যযন্ত্র! বুঝেছি, এ দৃশ্য আমার অবচেতন মন আমায় দেখিয়েছে, সাধনায় সিদ্ধি লাভের আসল মার্গদর্শন করাতে গিয়ে। বনদেব তোমায় আবার প্রণাম আমার সম্বিৎ ফেরানোর জন্য"।

তথাগত দেখলেন, তিনি অশ্বত্থবৃক্ষটির তলেই শুয়ে আছেন। শুধু খুব ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, নড়তে পারছেন না। তথাগত, মনে মনে বললেন, -"ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন, সেই খাদ্যের কোন চিহ্নই তো এখানে নেই। কোন ভোজ্য ফলের বৃক্ষও তো দেখা যাচ্ছে না। শরীরের আর কোন শক্তিই নেই, যে উঠে, বন মধ্যে ঘুরে, খাদ্য অন্বেষণ করবো! কি করা যায়! আরে, দূরে নদী তীর ঘেঁষে দুজন

স্ত্রীলোক এ পথে আসছে না! এও কি মায়ার খেলা! এও কি আমার মনের ভ্রম! তাই হবে বোধহয়, নয়তো, এ গভীর অরণ্যে, এভাবে সুসজ্জিতা হয়ে দুই নারী! দেখে তো ধনী বলেও প্রতীত হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভ্রম। ক্ষুধার জ্বালায় বার বার ভ্রম দেখছি।"

“দাসী পূর্ণা, এখন সময় কত হলো বলো তো ? পথ যে আর ফুরায় না। সেই “সেনানী” গ্রাম থেকে হাঁটতে হাঁটতে বনদেবতার উদ্দেশ্যে আসছি বনপথে। কতটা বনপথ পার হলাম, কোথায় সেই দেববৃক্ষ, যার তলদেশে বনদেবতার স্থান ? আরো কত ভেতরে বলো তো! খোকার জন্য চিন্তা হচ্ছে।"

-"দেবী সুজাতা, আর বোধহয় বেশী দূর নয় । বণিক শ্রেষ্ঠী নন্দীক মহাশয় তো জানেন, আপনি খোকার জন্য বনদেবতার কাছে পূজা দিতে এসেছেন। একটু সময় তো লাগবে ফিরতে। ততক্ষন, তিনিই খোকাকে সামলাবেন না হয়।"

-"হ্যাঁ, তিনি পুত্র অন্তপ্রাণ। চোখে হারান ছেলেকে। তিনি খোকাকে এতটুকু দৌরাত্ম্য করতে দেবেন না। ঠিক ভুলিয়ে রাখবেন। তিনিই তো আমাকে খোকার জন্য, পূজো দিতে পাঠিয়েছেন।"

-"হবেই তো। বিবাহের অনেক পরে পাওয়া এই পুত্র তো, বনদেবতার কাছে মানত করে পাওয়া। তিনি পুত্র প্রাপ্তির জন্য নিজে মানত করেছিলেন । সেদিন, আপনারা দুজনে, একসাথে এসে বনদেবতার কাছে প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন। আমিও এসেছিলাম। তার পর, এই পুত্র প্রাপ্তি। এই খোকা তো বনদেবতার আশীর্বাদ। "

-"ঠিক বলেছো পূর্ণা"। দেবী সুজাতা এরপর নীরবে অগ্রসর হলেন।

-"আরে, ওই অশথবৃক্ষ তলে বসে, ওই সন্ন্যাসী কে? বনদেবতাই সন্ন্যাসী বেশে বসে নেই তো দেবী ?"

-"চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি। তোমার হাতে, বনদেবতার পূজার সামগ্রীসকল, ঠিক ঠাক আছে তো ?"

-"হ্যাঁ দেবী, রৌপ্য থালায়, পুষ্পমাল্য, পুষ্প, ফল, পরমান্ন ভোগ, ধূপ, দীপ সবই সাজানো আছে। নৈরঞ্জনা নদীর জলও নিয়েছি পাত্রে। সঙ্গে, চন্দন-কুমকুমও আছে। দেখে নিন দেবী সুজাতা।"

-"দ্রব্য সামগ্রী সকল, যত্ন সহকারে রাখো। আর চলো, আগে ঐ সন্ন্যাসীর কাছে যাই।"

-" সাবধানে দেবী। আগে তো এনাকে এখানে দেখিনি। কিরকম রুগ্ন, শীর্ণ, কঙ্কালসার চেহারা। চোখ দুটো কোটরাগত। জীর্ণ মলিন বস্ত্র। কোন অপদেবতা নয় তো ? বন মধ্যে অনেক অপদেবতার অধিষ্ঠান থাকে বলে শুনেছি দেবী। তারা মানুষের রূপধারণ করে মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত পান করে নিজেদের তৃষ্ণা মেটায়, শক্তি অর্জন করে। তাই দেবী, সাবধান।"

-" ধুর্, তোমার যেমন চিন্তা -ভাবনা! অপদেবতারা কখনো সাধুর বেশধারণ করে? উনি সন্ন্যাসী বেশে নিশ্চয়ই বনদেবতা। আমাদের পরীক্ষা নিতে, এখানে এসে বসে আছেন। আমরা ভয় পাই কিনা দেখতে। ভালো করে দ্যাখ, কেমন সৌম প্রশান্ত মুখমন্ডল। এই উজ্জ্বল দীপ্ত রূপ কি কোন অপদেবতার হতে পারে?

উনি নিশ্চয়ই বনদেবতা। ওনারই পায়ে আমি আমার প্রণাম - পূজা- নৈবেদ্য পরমান্ন অর্পন করবো। ওনার শান্ত দৈব রূপ আমায় আপনা- থেকেই প্রণত করেছে ওনার চরণে।"

-"দেখুন দেবী, উনি কিন্তু, আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। আমার ভয় করছে ওনাকে দেখে।"
-"তোমায় ওনার কাছে যেতে হবে না পূর্ণা, তুমি আমায় পূজার থালা আর ভোগের থালা দিয়ে, এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি ওনার পূজা সেরে আসছি। উনি আমার পূজার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছেন।"

দেবী সুজাতা অগ্রসর হলেন।

-"প্রণাম দেব্। আমার অপরাধ মার্জনা করে, আমার পূজা- নৈবেদ্য -ভোগ গ্রহন পূর্বক আমায় আশির্বাদ করুন। আপনার প্রসাদে আমি পুত্র সন্তান লাভ করে ধন্য হয়েছি। তাই, আপনার পায়ে আমাদের প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম। হে বনদেবতা, আমার পায়সান্ন ভোগ গ্রহণ করে, আমার সন্তানের ওপর আপনার আশীর্বাদ ও কৃপা দৃষ্টি আজীবন বজায় রাখুন প্রভু।"

-" আমি ভীষন ক্ষুধার্ত। তোমার পরমান্ন আমি নিশ্চয়ই গ্রহন করবো। তবে তার আগে আমি বলে নিই, আমি বনদেবতা নই। আমি এক বনবাসী তপস্বী, সন্ন্যাসী। ক্ষুধা অস্বীকার করে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সাধনা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু, আমি বুঝেছি, এ আমার অন্যায় হয়েছে। মঝঝিম পন্থা অবলম্বন করাই আমার উচিত ছিল। আমাকে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়ে, শক্তি ফিরিয়ে

দাও দেবী।" বিস্ময়ে বাকরূদ্ধ হয়ে দেবী সুজাতা, পরমান্নের পাত্রটি তুলে দিলেন, তথাগতের উদ্দেশ্যে।

-" নৈবেদ্য ভোগ গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন আমায় দেব্।"

সুজাতার আকুল অর্পনে সন্তুষ্ট হলেন তথাগত। এক নিঃশ্বাসে পান করলেন পরমান্ন।

-"কি অমৃতময় এই পরমান্নের স্বাদ ! ধন্য হলো হৃদয়।" সন্ন্যাসী তথাগতের তৃপ্ত স্বীকারোক্তি।

আর সুজাতা - ভুলে গেলেন বনদেবতার কথা। সকল দেবতা একাকার হয়ে মিশে গেলো সন্ন্যাসীর মাঝে। সুজাতার দৈব ভক্তি, দৈব প্রেম এক হয়ে ঝরে পড়লো সেদিন সন্ন্যাসীর পায়ে। ইতিহাস লিখে রাখলো দিনটার কথা। সাক্ষী থাকলো প্রকৃতি।

তথাগত শক্তি ফিরে পেয়ে, নবজন্ম লাভ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন সুজাতাকে

--"চিরকল্যাণ হোক তব কল্যাণী"।

তারপর ধীরে, শান্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে গেলেন, বনের আরো গভীরে।

সুজাতা,ভাবতে লাগলেন,-" উনি সত্যিই কি সন্ন্যাসী, নাকি, বনদেবতাই ছলনা করে পূজা পরমান্ন গ্রহন করলেন না তো! ওনাকে পূজা করে, ভোগ নিবেদন করে মনটা এতো আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে কেন! কেন বারবার শুনতে পাচ্ছি সেই মধুরমন্দ্র ধ্বনি-

"চিরকল্যাণ হোক তব কল্যাণী।"

সুজাতার হুঁশ ফিরল পূর্ণার স্পর্শে।

-"চলুন, ফিরতে হবে দেবী। বণিক শ্রেষ্ঠী ও খোকা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।"

অতঃপর দেবী সুজাতা ও পূর্ণা প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হল।

তখন অলক্ষ্য থেকে ধ্বনিত হলো ধ্যান মন্দ্রিত স্বর –

ওঁ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ওঁ ধম্মং শরণং গচ্ছামি

ওঁ সংঘং শরণং গচ্ছামি।

স্বপ্নতরণী

______________ সময়টা ৩১০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের। এশিয়ার লাদাখ অঞ্চলের, দাহ গ্রামের ঘটনা। এক বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা তার মেয়ের কাছে ছুটে এসেছে-

-"দোলমা, দোলমা-ঘরে আছিস ?"

-"হাঁপাচ্ছিস কেন ? কি হয়েছে ?"

-" এইমাত্র শুনলাম, এক আশ্চর্য ঘটনার কথা। জামাই ক্যাসান্ডার, ম্যাসাডোনিয়ায় গিয়েছিল না ? সেখানকার খবর পেলাম। পত্র এসেছে তোর ভাইয়ের কাছে। তাই জানাতে এলাম।"

-" বীর আলেকজান্ডার মারা যাওয়ার পর তো, ম্যাসাডোনিয়ার সিংহাসন দখল নিয়ে, সেই যে লড়াই শুরু হলো, সেই লোভের রাজ্য দখলকারী- লড়াইতে, তোমার জামাই, ক্যাসান্ডারও তো জুড়ে গেলো সবার সাথে, অন্যের কথায় নেচে । আর আমাকে, নিজের কোলের ছেলেকে, সবকিছু অবহেলায় ফেলে রেখে, দলের সাথে ভিড়ে, চলে গেলো, সেই সুদূর ম্যাসাডোনিয়ায়। ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে আমি কি করবো, কি খাবো কোথায় যাবো একবারও ভেবে দেখল?"

-"পুরুষ মানুষরা এরকমই হয় রে মা, এরকমই হয়। তার ওপর, ক্যাসান্ডার ছিল বীর আলেকজান্ডারের, সেনানীদের মধ্যে, প্রিয়তম সৈন্য। তার কি সারাজীবন ঘরে আটকে বসে থাকলে চলে? এ তো তোর বিয়ের আগেই ভাবার কথা ছিল। তখন, আমরা তোকে কি কম বুঝিয়েছিলাম? কিন্তু, তুই তো শুনলি না আমাদের কথা। এখন বলে লাভ কি, বল? "

-" এখন তো আমার অসময়, তাই তুই তো একথা বলবিই। তখন, ক্যাসান্ডারকে মানুষ হিসেবে তোদেরও তো পছন্দ হয়েছিলো। "

-" তুই কি করে বুঝবি, ক্যাসান্ডার চলে যাওয়ার পর থেকে, আমি রোজ তোর জন্য, ক্যাসান্ডারের জন্য, ল্লামোর কাছে মাথা ঠুকে, প্রার্থনা করতে, কতবার ল্লাম্মো গেছি। কতবার যে, ল্লা এর পাথরে ফুল দিয়ে সাজিয়ে এসেছি তার হিসাব নেই।"

-" যাক্, বল্, কি সংবাদ এসেছে ওখান থেকে ? আমার কথা, ছেলের কথা কি কিছু বলেছে বা জানতে চেয়েছে সে ?"

-"ওরে, সেটাই তো বলতে এসেছি। শুনলাম, ক্যাসান্ডারের মনের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে। ম্যাসিডোনিয়ায়, আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোক্সানাকে ও তাদের পুত্র - চতুর্থ আলেকজান্ডারকে হত্যা করে, এখন ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসনে বসেছেন আমাদের ক্যাসান্ডার। ল্লা ও ল্লাম্মো দুজনেই আমার পূজা নিয়েছেন ও আমার প্রার্থনা শুনেছেন। জামাই কে আশীর্বাদ করেছেন। এবার তোদেরও সুদিন আসতে চলেছে। চিন্তা করিস না।

আনন্দ কর।এখন তুই হলি রানী আর তোর ছেলে হল গিয়ে রাজপুত্র। এই দ্রোকপা গ্রামে, বিশেষ করে এই চারটি গ্রাম- দাহ, হনু, গারকন, দারচিক গ্রামে তো রটেই গেছে একথা। এতক্ষণে দূর দূর গ্রামেও বোধহয় সবাই জেনে গেছে সংবাদটা। এই নে প্রসাদ মিষ্টি। চোখের জল মোছ, আনন্দ কর"।

ভেড়ার কম্বলের চাদর গায়ে জড়িয়ে, নরম হাত বাড়িয়ে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে এলো ভাগন গিয়ালপো। চার বছর বয়সের সেই নাতিকে কোলে তুলে নিলো দ্রোকপা দিদিমা।

-" আমাদের কথা, তার মানে কিছুই তিনি বলেন নি, তাই না?" করুণ স্বরে বলে উঠলো নীলা দোলমা।

-" বলবে বলবে, পরে বলবে, সবে তো সিংহাসনে বসেছেন, এখন তাঁর কত কাজ। নিজেদের কথা ভাবার সময় আছে? ধৈর্য্য ধর বেটী। ধৈর্য ধর। সুসময় এল বলে।"

তারপর কেটে গেছে মাস-বছর-যুগ পরপর। কতবছর তার হিসাব নেই। দোলমা, ছেলে কে বড় করেছে মেষ পালন করে, কম্বল বুনে। দ্রোকপা শাশুড়ি, জামাইকে আরেকটিবার দেখার আশা নিয়েই চির বিদায় নিয়ে নিলো পৃথিবী থেকে। ভাগন, এখন প্রায় ,ষোল বছরের । তার পৃথিবী বলতে শুধু মা আর মামারা। বুকে একরাশ জমানো ঘৃণা- বাবার ওপর, গ্রীস দেশের ওপর, বিদেশের ওপর। ভালোবাসে শুধুই মা কে, মামাদেরকে, লাডাকের মাটিকে আর সমগ্র দ্রোকপা জাতিকে। ঘুরে বেড়ায় লাডাকের এখানে ওখানে, মেষ চড়ায়, বাঁশিতে সুর

তোলে, বন্ধুদের সাথে নাচ-গান করে উৎসবে। এরকমই এক উৎসবে- ওদের গ্রামে, বেড়াতে এসেছে তীব্বতী এক মেয়ে। লালমৈত্রেয় এর মন্দিরে প্রথম দেখা মেয়েটির সাথে, সঙ্গে তার বাবা ও মা।

-"আমরা এ দেশে নতুন, অতিথি। খোকা, তুমি কি আমাদের দেখাবে এ জায়গাটা ? দেখাবে এখানকার পথ-ঘাট, মন্দির, হ্রদ, নদী, পাহাড় ? পারবে দেখাতে ?"

তিব্বতী ভদ্রলোকের কথায়, ভাগন, মাথা নেড়ে জানালো,- হ্যাঁ সে পারবে।

নিজেকে এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে হলো ভাগনের। ওনার স্ত্রী, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন -"-কি নাম তোমার?"

-"ভাগন, ভাগন গিয়ালপো"

-নামটা বলেই দেখে নিলো তিব্বতী কিশোরী মেয়েটিকে। ভদ্রমহিলা, ভাগনের চুলে বিলি কেটে দিয়ে বললো-

,-"খুব সুন্দর নাম।"

-"আজ বাড়িতে মা কে বলে, কাল আমি আসবো, আপনাদের সব দেখাতে। নাহলে মা চিন্তা করবে। কাল, সকাল সকাল, এই মন্দিরেই দেখা করবো আমি, আপনাদের সাথে। এখন কি, আপনারা, আমার বাড়ি গিয়ে, মা এর সাথে আলাপ করে আসবেন?"

তিব্বতী ভদ্রলোকের ইচ্ছে না থাকলেও, ভদ্রমহিলা বললেন,-" এই বিদেশে, অন্তত, একজন বন্ধুর ঘরে গিয়ে

মাধ্বী পান করে আসি চলো। আলাপ করে আসি।কখন কি দরকার হয় !"

সবাই পাহাড়ি পথ ভেঙে হাঁটতে লাগলো। সামনে সামনে ভাগন। বাঁশির সাথে নেচে নেচে এগিয়ে চললো। একবারও তাকিয়ে দেখলো না, তার বাঁশির সুরে, তিব্বতী কিশোরী মেয়েটিও কিরকম নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে।

-" স্টেনজিন, ধীরে চলো" তীব্বতী ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন।

-"ওই যে পাহাড়ী টিলাটা দেখা যাচ্ছে, ওর বাঁকে, বাগান ঘেরা টঙটাই আমার ঘর।"ভাগন আঙুল তুলে দেখালো ওদের।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন,-"ভাগন,তোমার পুরো নাম কি? কয়জন আছে তোমার ঘরে ?"

-"আমার পুরো নাম,ভাগন ন্যামগ্যাল গিয়ালপো ।আমার ঘরে, আমার মা ও আমি থাকি।আগে দিদা আসতো। দিদা দ্রোকপা। আমার মামারাও দ্রোকপা। কিন্তু,আমি শুনেছি,আমি গ্রীসও দ্রোকপা এই দুই এরই সন্তান। আমার বাবা গ্রীসদেশীয় ছিলেন। আমার মা, খাঁটি আর্য দ্রোকপা। আমি মায়ের কাছেই মানুষ।বাবা চলে গেছেন গ্রীস দেশের ম্যাসিডোনিয়ায়। তারপর, আর কোন যোগাযোগ নেই। আমার মামারা কাছেই একটা টঙ্ এ থাকেন। আপনারা আসুন আমার ঘরে,আমি ওনাদেরও ডেকে আনছি। সবার সাথে আলাপ হবে।"

হাসিমুখে ভাগন এগিয়ে গেলো। তীব্বতী পরিবার ভাগনের পিছু পিছু এগিয়ে চললো। মাথার ওপর সোনালী রোদ জরির আলপনা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে নীল আকাশের চাদরটা। পাহাড়ী খাঁজে আটকে গেছে সেই নীল চাদরের কোণা। পাহাড়ী ঝোরা আর পীচ ফলেরগাছ দিয়ে সাজানো,পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট ছোট্ট লাল, হলুদ, নীল, সবুজের টঙঘরগুলো সাদা বরফের পথের ওপর, সাদা ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো সুন্দর লাগছে। লামা পরিবারের মন ভরে উঠলো। একটি টঙ্ এর সামনে দাঁড়িয়ে ভাগন, "মা বাইরে এসো" বলে হাঁক দিল।

ভিতর থেকে মহিলা কন্ঠে, পাল্টা ধমক ভেসে এলো-- "পরব বলে সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়াবি ? মেষগুলোকে দেখবি না ? ঘরে এসে খাবার খেয়ে, মেষগুলো নিয়ে বের হ।"

-"মা, ঘরে অতিথি এসেছে। আগে তুমি বার হও বাইরে।"

ঘর থেকে বের হয়ে এলেন বছর পঁয়ত্রিশএর, এক দ্রোকপা মহিলা। লাল পোষাক আর মাথায় লাল টুপিতে পালক দিয়ে সেজে গুজে তৈরী পরব পালনের জন্য।

-"মা, এনারা নতুন এসেছেন আমাদের অঞ্চলে। আমাকে নিয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখতে চান। আমি এনাদের আমার গ্রাম, অঞ্চল সব ঘুরিয়ে দেখাবো?"

-" নিশ্চয়ই, অতিথি দেব ভব। নিশ্চয়ই ওনাদের ইচ্ছা পূরণ করবে। আপাতত, এখন আপনারা আমার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি ধন্য হবো।" হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে স্বাগত জানালো মহিলা।তিব্বতী

পরিবারও প্রতি নমস্কার করে হাসিমুখে আতিথ্য স্বীকার করলো।তারপর,বাগানের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ঢুকে এলো।

-" আমি, ভাগনের মা দোলমা। আমার স্বামী, বীর আলেকজান্ডার এর সেনানীদের একজন ছিলেন। নাম ক্যাসান্ডার। নাম শুনেছেন কি না, জানিনা। এখন উনি ম্যাসিডোনিয়াতেই আছেন।আমি ছেলেকে নিয়ে এখানে। এখানে আমার ভাই, সানওয়ার তার পরিবারের সাথে আছে, আমারও দেখাশোনা করে। এই ছোট্ট ঘরটি, ক্যাসান্ডার আমাদের দিয়ে গেছেন, থাকার জন্য। আপনারা তীব্বত থেকে এসেছেন জেনে ভালো লাগছে।"

-"আমরা, এখানে আসতে আসতে ভাগনের কাছে কিছু শুনেছি। আপনার ঘরটা ছোটো হলেও, খুব সুন্দর করে সাজানো। দারিদ্র্য কে ঢেকে দিয়েছে রুচিশীলতা। দুঃখকষ্ট কে ঢেকে দিয়েছে ভালোবাসার আনন্দ। ঘরের সামনের বাগানটা, সেটাই জানিয়ে দেয়।" বলে,তীব্বতী ভদ্রলোকটি চুপ করলেন।

তীব্বতী ভদ্রমহিলা বললেন," হ্যাঁ, আমরা তীব্বতের লাসা থেকে এসেছি। এখানে শুনেছি সাগা দাওয়া উৎসব খুব ভালো ধূমধামের সাথে পালিত হয়। আমরা সেই উৎসবে যোগ দিতে এসেছি।"

দোলমা, তিনজনকে চমরী গাইয়ের দুধ পান করতে দিলো। একটু পরে দ্বিপ্রাহরিক আহারেও ওনাদের আমন্ত্রণ জানালো।

-" মা, ততক্ষন আমি মামাকে ডেকে আনবো ? আজ সবারই একসাথে খাওয়াদাওয়া হোক।"

-" অবশ্যই পুত্র, উত্তম প্রস্তাব। ওনাদের সাথে আলাপও হয়ে যাবে।"

" মিষ্টি মেয়ে তুমি। কি নাম তোমার?" বলে দোলমা তীব্বতী বাচ্চামেয়েটি কে আদর করে দিলো।

-"আমার নাম স্টেনজিন। স্টেনজিন পালমো।" - মেয়েটি হাসিমুখে জানালো।

-"মা, আমি কি স্টেনজিন কে নিয়ে মামার বাড়ি যাবো ?" - ভাগন জিজ্ঞাসা করল। ভাগনের ইচ্ছা করছিল, শুধু স্টেনজিনকে নিয়ে বেড়াতে যায়, স্টেনজিনের সাথে খেলা করে, গল্প করে।

স্টেনজিনের মা, বলে উঠলেন--" ও তো আমাদের সাথে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, ও এখন ভীষণ ক্লান্ত । একটু বিশ্রাম নিক। তুমি ততক্ষণ ঘুরে এসো, তারপর, ওকে তোমাদের বাগান দেখাবে, গল্প করবে, খেলা করবে। মনের আনন্দে মজা করবে কেমন?"

ভাগনের মাও বলে উঠলেন,--" হ্যাঁ হ্যাঁ ও আগে দুধ টা খেয়ে, একটু জোর করে নিক। তুই সেই ফাঁকে চট করে ঘুরে আয়।"

ভাগন, কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে, স্টেনজিনের সাথে, হাসি বিনিময় করে গেল। টুকিটাকি গল্পে, দোলমা মেতে উঠলো তিব্বতী পরিবারের সাথে। লাডাকের দ্রোকপা অঞ্চলে সাগা দাওয়া উৎসব কিভাবে পালন করা হয়, তার সাথে সাথেই, দোলমা বলতে

লাগলো, তার নিজের জীবনের গল্প, আলেকজান্ডারের গল্প, ক্যাসান্ডারের গল্প, ওখানের আর অন্য পরবের গল্প। দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। স্টেনজিন, দুধ খেয়ে নিয়ে, ততক্ষণে, ভাগনের বাঁশি নিয়ে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভাগন, কিছুক্ষন পরেই ফিরেএলো। সঙ্গে সানওয়ার, দোলমার ভাই, ভাগনের মামা।

-"এসেছিস ? এই দ্যাখ, আমাদের অতিথি পরিবার। তীব্বত থেকে এসেছেন।আমাদের দেশের সাগা দাওয়া উৎসব পালন দেখতে।" দোলমা, ভাই- সানওয়ারকে তীব্বতী পরিবারটির সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভাগন , স্টেনজিনকে নিয়ে গেলো বাগান দেখাতে।

-"কত ফল আর সব্জি হয়েছে বাগানে !"

-"সবই আমার মা ফলিয়েছেন নিজে হাতে।" বলে, গর্ব করে জানালো ভাগন।

-" ঐ লাল লাল ফুলগুলোকে কি ফুল বলে ?" স্টেনজিন প্রশ্ন করল।

-"ওগুলোকে লিলি ফুল বলে।" ভাগন জানালো।

-" স্টেনজিন দ্যাখো দ্যাখো, ঐ লালচেরী ফলগুলো কি সুন্দর ফ'লে আছে! ঠিক তোমার মত । হি হিঃ" ভাগন হাসতে হাসতে বললো।

-"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আর ঐ হলুদ ফুলগুলো ঠিক তোমার মত ফুটফুট করছে।"বলে মুচকি হাসলো স্টেনজিন।

তারপর বললো “ভাগন আমাকে একবার তোমার বাঁশি শোনাবে না ? কি সুন্দর বাঁশি বাজাও তুমি !" স্টেনজিনের এই কথায় লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো ভাগন।

-"দাদা ভাগন, আমরা এসে গেছি।" বলে তিনটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ঢুকলো বাগানে। সঙ্গে, এক মহিলা, উজ্জ্বল কমলা রঙের টুপি ও লাল পোষাক পরে। গলায় পাথরের মালা, কানে গলায় পিতলের কুন্ডল ও হাসুলি হার। দেখে বোঝা যায় খুব সেজেছে।

-"ওরা কারা ভাগন?" প্রশ্ন রাখলো স্টেনজিন।

-"ওই মহিলা আমার মামী আর বাচ্চারা আমার ভাই-বোন। এসো আমরা সবাইবাগানে খেলি।" ভাগন জানালো।

মহিলা, স্টেনজিনকে আর ভাগনকে আদর করে টঙের ঘরে ঢুকে গেলো। ভাগনরা সবাই খেলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দোলমা সবাই কে খাওয়ার জন্য ডাকলো।

-"আজকের সাগা দাওয়া উৎসব এর দশম দিনে ,আপনাদের সকলকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে, ভগবান তথাগতকে স্মরণ করে, ধন্যবাদ জানিয়ে, খেতে বসুন। " দোলমা সবার উদ্দেশ্যে বললো।

খাওয়ার আয়োজন যেখানে হয়েছে, তার মাঝখানে, সব সুখাদ্য সাজানো। সেই স্থানের, চারপাশে সাজানো, কম্বলের আসন যাতে বসার ব্যবস্থা হয়েছে সকলের।

-" খুব সুন্দর আয়োজন" তীব্বতী ভদ্রমহিলা বললেন।

-"তার চেয়েও সুন্দর সুখাদ্যগুলি। সুগন্ধে আমার ক্ষিধে দ্বিগুণ হয়ে উঠছে।" তীব্বতী ভদ্রলোকের কন্ঠে শোনা গেলো অকুণ্ঠ প্রশংসা।

-"চলুন, বসে পড়া যাক্" সানওয়ার হাসতে হাসতে বললো, "বাচ্চারা আসন দখল করো।"

সানওয়ারের স্ত্রী ও দোলমা খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

"কত কি বানিয়েছেন আপনি!" তীব্বতী ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

সানওয়ার জানাতে লাগলো -" এটা হচ্ছে থুকপা, এটি পপোট শস্যের মশলাযুক্ত পানীয়, এইটা খামির রুটি, এটি মারখুর আজোকস্কিন।"

দোলমা বলে উঠলো, "এগুলো সানওয়ারের স্ত্রী নিয়ে এলো বানিয়ে -কাবচে পুরী পোলি, বাক গমের কেক, পাচা। আর, দই, পান তো আছেই। পরব বলে কথা।"

তীব্বতী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, সাগা দাওয়া তে আর কি কি পালন হয়-বুদ্ধের পূজার্চনা, খাওয়া দাওয়া ছাড়া ?

সানওয়ার জানালো, আমরা চান্দ্রমাস এর পুরো চতুর্থ মাস, বুদ্ধের মাস হিসাবে পালন করি, যার পনেরোতম দিনটি, উৎসব পালনের শীর্ষে পৌঁছায়। এদিন আমরা,খাওয়া দাওয়া ছাড়াও সাগা করি। গীলগামেশের কালজয়ী গল্প বলি ও সেই কাহিনীগুলোকে, নৃত্যের তালে তালে, বাজনার সাহায্যে বাস্তবায়ন করি। একেই সাগা বলে, শুনেছেন বোধহয়। এছাড়াও, লোকনৃত্য,

জাবরো নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত, হস্তশিল্প পণ্য, মুখোশ নৃত্য, তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা, পোলো খেলা-এইসব আনন্দ হয় আর কি! আপনারা এসেছেন যখন, তখন অবশ্যই বাকি কটা দিন থেকে, পুরো অনুষ্ঠানগুলো দেখে যাবেন।"

-"শুনেছি, জাবরো নৃত্য দেখার মতো সুন্দর।" তীব্বতী ভদ্রমহিলা বললেন।

-"হ্যাঁ, খুব সুন্দর। এটি লাদাখের চাং-থাং অঞ্চলের ললিত নৃত্য। প্রানবন্ত গানের সাথে, মনোমুগ্ধকর এই নৃত্যে, পুরুষ -মহিলা একত্রিত হয়ে বৃত্তে বা সারিতে দাঁড়িয়ে নাচে। খুব ভালো লাগে দেখতে।" সানওয়ারের স্ত্রী হাসিমুখে বললেন।

দোলমা সবাই কে জিজ্ঞেস করল,-" আর একটু মশলাঝোল দি? খামির রুটি আরেকটা করে ? কেকের আরেকটু অংশ কার লাগবে? "

"আর না, পেট ভরে গেছে, ভীষন সুস্বাদু খাবার, অনেকটা খেয়ে নিলাম। এবার আমরা আজ আসি। কাল ভাগন আবার, আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে। সূর্যোদয়ের একটু পরেই আমরা সবাই বেরোব,তাহলে ভাগন, কাল লাল মৈত্রেয় মন্দিরে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে? " তীব্বতী ভদ্রলোক জানালেন।

-"আপনারা, লাদাখ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আরেকবার আমার অতিথি হবেন, এ আমার অনুরোধ থাকলো।" দোলমা জানালো।

-"নিশ্চয়ই," তীব্বতী ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা দুজনেই কথা দিলেন।

পরদিন সকালে ভোররাত থাকতে, ভাগন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো।

-" মা, ক'টা বাজে ? উঠে পড়ো, আমাকে, লাল মৈত্রেয় মন্দিরে যেতে হবে না ?" ভাগন মা' কে ডেকে তুললো ঘুম থেকে।

-" তুই হাত মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার করে ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে, ভালো পোষাক পরে আয়। আমি তোর প্রাতরাশের ব্যবস্থা করছি।" ঘুম জড়ানো গলায়, দোলমা, বিছানায় বসেই ছেলেকে বললো। সবকিছু ঠিকঠাক করে তৈরী হয়ে আসতে আসতে, ভাগনের সময় লেগে গেলো বেশখানিকটা। সে ব্যাগে লুকিয়ে,তার বাঁশিটাও নিয়ে নিল। কিছু আপেল,চেরী ফল, আখরোট, কাজু নিয়ে নিল ব্যাগে। আর চামড়ার পাত্রে জল। দোলমা বললো, -" মামীর বানানো গমের কেকটার, একটু টুকরো পড়ে আছে, ব্যাগে ঢুকিয়ে নে।" ভাগন, কেকটা ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে বললো,- "কত খাবো?"

-" নে, খেয়ে নে", বলে, দোলমা, ছেলের দিকে এগিয়ে দিল, এক বড় পাত্রে চমরী গাইএর দুধ, আর, চারটি খামির রুটি। ঐ খেয়ে ভাগনের পেট ভরে গেলো, সে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে পড়লো।

ঘর থেকে বার হতেই, আকাশের লাল সূর্যটা, মুচকি হেসে জানিয়ে দিলো, দিনটা আনন্দে কাটুক।

লাল মৈত্রেয় মন্দিরে আরতির ঘন্টা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভাগন দেখলো, তীব্বতী পরিবার দাঁড়িয়ে আছেন, আর আরতি দেখছেন। স্টেনজিন বলে উঠলো--"মা, ঐ তো দেখো ভাগন। ভাগন, সুপ্রভাত।"

ভাগন সবাই কে সুপ্রভাত জানালো।

-"তোমার মুখোশটা গিলগামেশএর। খুব ভালো মুখোশটা। কে দিয়েছে?" ভাগন স্টেনজিনকে জিজ্ঞাসা করলো।

-"বাবা দিয়েছে।" স্টেনজিন বললো-" ভাগন, তোমার বাঁশিটা এনেছো ?"

-" তুমি তো দেখছি আমার বাঁশির প্রেমে পড়ে গেছো স্টেনজিন।"

-" যাঃ,কি যে বলো! " বলে স্টেনজিন লজ্জা পেয়ে গেল। ভাগন, জোরে হেসে উঠলো। স্টেনজিন বললো,--" মা-বাবা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। একটু ধীরে চলো ভাগন।" ভাগন দাঁড়িয়ে পড়লো।

-" দাঁড়ালে কেন ভাগন?" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।-" আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।" বলে, ভাগন, মিষ্টি একটা হাসি দিল।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "তুমি খুব ভালো ছেলে। তা ব্যাগে অত কি নিয়েছো?"

ভাগন, সলজ্জ হাসি দিয়ে বললো,-"মা, জোর করে কিছু খাবার ও জল দিয়ে দিয়েছে।"

-" ভালোই তো করেছেন, সারাদিন ঘুরলে, লাগবে তো।"

"আচ্ছা ভাগন, আজ আমরা কি কি দেখবো ?"- স্টেনজিন সোৎসাহে প্রশ্ন করলো।

-" কাছেই একটা বিশাল হ্রদ আছে, একটা মঠ আছে, কিছু দেবতার স্থান আছে, আপেল বাগান আছে, কিছু গিরিপথ আছে, পাহাড় আছে, আর আছে রাজপ্রাসাদ, উপত্যকা। এসব দেখতে দেখতেই সারাটা দিন লেগে যাবে। " ভাগন জানালো।

“তবে, আজ সব দেখা শেষ না হলে, কালকেও ঘুরতে পারি। কিন্তু, তারপর দুই দিন ব্যস্ত থাকবো সাগা দাওয়ার অনুষ্ঠান মহড়ায়। তাই আসতে পারবো না।" ভাগন এক নিঃশ্বাসে জানালো।

তীব্বতী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি অনুষ্ঠানে কি করবে ভাগন"

ভাগন গর্বের সঙ্গে জানিয়ে দিলো,-"আমি বৃন্দ বাদনে অংশ নেব।", তারপর, কি ভেবে বললো, --" আচ্ছা, আপনারা, তো জাবরো নৃত্যে সবাই অংশ নিতে পারেন। আমার মামারা, মা সবাই অংশ নেবে। ওনাদের সাথে আপনারাও যোগ দিন। আমি আপনাদের নৃত্য শিখিয়ে দিতে পারি।"

-" তাহলে তো খুব ভালোই হয়" ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন। স্টেনজিন, হাততালি দিয়ে বলে উঠলো -" কি মজা, কি মজা !"

-"আসুন, আমরা এসে গেছি, সোমোরিরি হ্রদের কাছে। ওই সামনে দেখুন।" বলে, ভাগন হাত তুলে দেখালো। অপূর্ব নিসর্গ আর নীল আকাশ এর তলায়, বিশাল নীল

শান্ত জলাধার মনকে ভিজিয়ে দিল। একদৃষ্টিতে, সবাই অনেক ক্ষণ তাকিয়ে থাকলো জলের দিকে।

কিছু ক্ষণ পর, ভদ্রমহিলা বললেন--"চলো, এই হ্রদের ধারে বসে, আমরা প্রাতরাশ সেরে নিই।"

মহিলা ব্যাগ থেকে কেক, ফল বার করে সবাই কে দিলেন। ভাগন নিতে চাইছিল না, তবু, উনি ভাগনকে জোর করে দিলেন। প্রাতরাশ সেরে, ওরা সবাই উঠে পড়লো ঘুরতে।

তীব্বতী ভদ্রলোক ভাগনকে বললেন--"ভাগন, পথে যেতে যেতে, তোমাদের এখানকার অন্য সব উৎসবের কথা আমাদের জানাও। জানতে মন চাইছে।"

-"নিশ্চয়ই জানাবো" ভাগন বললো। তারপর বলতে লাগলো, --" আমাদের দেশে আমরা, সাগা দাওয়া ছাড়াও, অনেক উৎসব পালন করি। যেমন, লোসার উৎসব, মামানি উৎসব, মুখোশ উৎসব।"

-"এগুলো কিভাবে পালন করা হয়?" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাগন জানালো, --"বছরের শুরুর দুই মাস বাদে, পনেরো দিন ধরে পালন করা হয় এই লোসার উৎসব। প্রথম তিন দিন, পবিত্র অগ্নিদেবের পূজা ও ওনার মন্ত্র উচ্চারণ করে পালন করা হয়। তারপরের দিন গুলো, ধর্ম পালন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ, ও তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, নিজেদের মধ্যে, দেখা সাক্ষাৎ ও আনন্দ মিলনে পালিত হয় এই উৎসব। মামানি উৎসব হলো, খাদ্য উৎসব। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী

খাবার বানিয়ে,পালিত হয় এই উৎসব। এরপর, আছে মুখোশ উৎসব। কাগজের মেশ মুখোশ পরে নৃত্যের মাধ্যমে পালিত হয় এই উৎসব। মুখোশগুলো দারুন দেখতে। বিদেশের বাজারে এগুলোর খুব চাহিদা।"

-" আচ্ছা,ভাগন, কি করে এই মুখোশগুলো বানানো হয় তুমি জানো"ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

-" হ্যাঁ, আমি দেখেছি বানাতে। ময়দা, মাটি, গোবর, কাগজ মিশিয়ে, তেঁতুলের বীজের গুঁড়া জলের সাথে মাখিয়ে লেই বানিয়ে আবার ঢালাই করে, এই মুখোশ গুলো বানানো হয়।"

-" বাব্বা! একটা শিল্প, না ?" ভদ্রমহিলা বললেন।

স্টেনজিন বায়না ধরলো, --"মা, আমি ঐ মুখোশ একটা নেবো।"

-"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।" বলে ভদ্রমহিলা ওকে থামালেন।

একে একে দেখা হলো, ন্যুব্রা উপত্যকা, খারদাংলা গিরিপথ, চৌম্বক পাহাড় । তারপর সবাই আবার বসে, দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারলেন। এবার ভাগন, নিজের খাবারগুলো, সবাইকে দিয়ে, সবার সাথে ভাগ করে নিয়ে একসাথে ভোজন করলো। ভোজনের পর, সবাই একটু বসে, ভাগনের বাঁশির সুর শুনলো। সেই সুরে, আবার সবাই মন চাঙ্গা করে নিলো।

-"ভাগন, এবার আমরা কি দেখবো" স্টেনজিন প্রশ্ন করলো।

-" এবার যাবো, চাংলা গিরিপথ। তারপর, ফিরে যাবো। আবার, কাল বার হবো। কেমন?" ভাগন জানালো।

তীব্বতী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দুজনেই সায় দিলেন ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ এইপর্যন্তই। আকাশে বিকেলের ছায়া। এতটা পথ ফিরতে হবে, নয়তো সন্ধ্যার আঁধার নেমে যাবে।“

পরদিন, ভাগন, একগুচ্ছ গোলাপ এনে দিয়ে বললো,- "স্টেনজিন এগুলো তোমার জন্য।"

স্টেনজিন গোলাপ এর উজ্জ্বল রঙ আর রূপে, মোহিত হয়ে গেলো। উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে। দেখলো না, ভাগনের দুচোখেও লেগে আছে গোলাপের রঙ। স্টেনজিনের আনন্দ দেখে, ভাগন কতটা আনন্দ পেলো, স্টেনজিন বুঝলো না।

ভদ্রমহিলা কিছু বুঝলেন কি ? স্বামীকে, অস্‌ফুটে বললেন-"মন্দ হবে না বলো ? আমার তো ভাগনকে খুবই পছন্দ। ওর পরিবার কেও।" ভদ্রলোক হেসে বললেন- "ওরা আগে বড় হোক, ওদের মত হোক, তারপর ভাববো।"

একে একে দেখা হলো "লে প্রাসাদ", "শে প্রাসাদ"। ঘুরে ঘুরে দেখতে সময় কেটে গেলো অনেকটা, সূর্য উঠে গেলো মাথার উপর। তারপর, কোটান নদীর ধারে বসে, বিশ্রাম নিয়ে, দ্বিপ্রহরের ভোজন সেরে নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন ওনারা। তখন পাহাড়ের খাঁজে রাখা কিছু অদ্‌ভুত দেখতে পাথরের ফলক চোখে পড়ল সবার। অবাক হয়ে

গেলেন ওনারা। কোন কোনটা আবার লাল রঙ করা। - "মা, এগুলো কি? " স্টেনজিন জিগ্গেস করলো।

ভাগন জানালো, -"এগুলো আমাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে বানানো। তাই, ফুল দিয়ে পূজা করে সাজানো আছে।"

"দেবতা কোথায় ? এ তো শুধুই পাথরের ফলক।" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাগন জানালো,-" এই পাথরের ফলকেই আছে দেবতার প্রতীক। যেমন, এই পাথরটি দেবী ভির্গোমাতার উদ্দেশ্যে বানানো, এটি দেবতা কৃষ্ণের জন্য। আর, ঐ যে পাথরটি, মাথাটা গোল মতো, ওটা আদি দেব মহাদেব পশুপতি নাথের জন্য। এখানকার মহিলারা এদেরকে, এভাবেই পূজা- প্রণাম - প্রার্থনা করে থাকেন" ভাগন জানালো।

দুদিন ধরে ঘুরে খুব ক্লান্ত সবাই। যেতে যেতে, পাহাড়ী খাঁজে, এক ঝর্না দেখে, সবার মনটা ভরে গেলো। ঠিক হলো, এখানেই বিশ্রাম নেবে।এখানেই ভোজন সারবে।

-"মা, এই পাথরের ওপর আমি বসবো?," বলে, স্টেনজিন বায়না ধরলো।

-"যে পাথরে ইচ্ছে বসো, কিন্তু, ঝর্নার বেশি কাছাকাছি যেও না।পড়ে গেলে মুস্কিল।" ভদ্রমহিলা বললেন।

ততক্ষণে, তীব্বতী ভদ্রলোক একটা পছন্দসই বড় পাথর দেখে বসে পড়েছেন। ভদ্রমহিলাও, ওনার কাছাকাছি, একটা বড় পাথরের ওপর বসে গেলেন। ভাগন সবে বসতে যাবে পাথরে, হঠাৎ,স্টেনজিন, চেঁচিয়ে উঠলো -

" দেখি ভাগন, তুমি যে পাথরে বসছো, তার মাথায় কি যেন একটা লেখা আছে।"

-"কি লেখা আছে স্টেনজিন?" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন। স্টেনজিন অনেক কষ্টে পড়লো-" ঠিক মতো পড়তে পারছি না, সম্ভবতঃ লেখা আছে-ক্যাসান্ডার।"

তীব্বতী ভদ্রলোক বললেন, -"স্টেনজিন, তুমি যে পাথরে বসেছো, সেটাতেও কি যেন লেখা আছে- সম্ভবতঃ দোলমা।"

সবাই চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষণ। নীরবতা ভেঙে, স্টেনজিন বললো -"ঐ দ্যাখো, ঐ পাথরের ওপর লেখা আছে আলেকজান্ডার।"

ভদ্রমহিলা বললেন-, -"নিশ্চয়ই এই নামগুলো, ভাগনের মা এর চেনা-জানা। যাক্, অতীত ভেবে লাভ নেই। বর্তমান এ ফেরো।এই নাও, একটা করে রুটি ধরো।" বলে, নিজের কবিতায়, নিজেই হেসে উঠলেন।

সবাই গল্প করতে করতেখাওয়া দাওয়া সারলো, শুধু ভাগনের মুখে হাসি নেই, মুখে কথা নেই। স্টেনজিন সেটা লক্ষ্য করে --" ভাগন, আজ আমাদের বাঁশি শোনাবে না" বলে বায়না ধরলো।

তখন ভাগন অগত্যা ব্যাগ থেকে বাঁশি বার করে শুরু করলো বাজাতে । স্টেনজিন ততক্ষনে, সবার আড়ালে, একটা পাথরে লিখে ফেলেছে -"স্টেনজিন" ও "ভাগন"। ভাগনের বাঁশির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো তীব্বতী পরিবার। ভাগনের মনটা একটু ভরে উঠলো। বিশেষ করে স্টেনজিন যখন প্রশংসা করলো।

হাসিমুখে স্টেনজিনের দিকে তাকাতেই, স্টেনজিন ইশারায় ওদের দুজনের নাম লেখা পাথরটা দেখিয়ে দিল। অজানা ভালোলাগা ও আনন্দে ভরে উঠলো ভাগনের পৃথিবী। সবাই তারপর, নানান গল্প করে বাড়ি ফিরে এলো। দুদিন কেটে গেলো মহড়ায়। সাগা-দাওয়ার শেষ দিন,সারা দিন আবার স্টেনজিনের সাথে। এক অজানা ভালোলাগার নেশায় কখন যে সব অনুষ্ঠান পালন হলো একসাথে! বোঝা - না বোঝার মাঝে রাত্রি হয়ে গেলো।

-“কাল আমরা তীব্বত ফিরে যাবো ভাগন। তুমি আসবে তো আমাদের বাড়ি ?" করুণ স্বরে জানতে চাইল স্টেনজিন। -"কালকেই ফিরে যাবে ? আমি তোমার বাসার হদিশ পাবো কি করে ? তুমি কি যোগাযোগ রাখবে আর?" ভাগনের গলায় দ্বিধার সুর ফুটে উঠলো অজান্তেই। "নিশ্চয়ই রাখবো ভাগন। আমি পত্র লিখতে পারি। বাবা শিখিয়েছেন। এখানে প্রায়ই আসেন কেউ না কেউ, আমাদের গ্রাম থেকে। তাদের হাত দিয়ে তোমাকে পত্র পাঠাবো। তুমি পড়তে পারো তো?" - অনেক আশা নিয়ে প্রশ্নটা করে স্টেনজিন তাকিয়ে থাকলো ভাগনের দিকে। ভাগন জানালো, -"মা এর কাছে শিখেছি অক্ষর পরিচয়। মা শিখেছিলো, আমার বাবার কাছে।“বলতে বলতে, ভাগন, স্টেনজিন এর দিকে এগিয়ে দিল একটা মুখোশ। ওদের দেশেই বানানো।
ভাগনের মা ও স্টেনজিনের মা দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালো। তারপর, ভাগনের হাত ধরে বাড়ি ফিরে এলো দোলমা। রাতের তারারা জেগে থাকলো সারা রাত, আর জেগে থাকলো ভাগন।

নিঠুর চরণ পদ্মে

________________ সকালের সূর্য সোনালী রঙের ছোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়েছে চারিধার। রন্ধনশালে, সুভদ্রা জলভরা কলসটা, কোল থেকে নামিয়ে দেখলো, দ্রৌপদী দিদি, উনানে আগুন তুলে দিয়ে রন্ধনের জোগাড় করছে।

-"দিদি, আজ ভ্রাতা কৃষ্ণ আসছেন ওনার কাছে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজন আমাদের কাছেই করবেন বলে, পত্র এসেছে"।

-" তাই নাকি ? সখা কৃষ্ণ আসছেন ? তাহলে তো ভালো মন্দ বেশ কিছু রন্ধন করতে হয়। তুমি আমাকে সাহায্য করবে বোন ?"

-"নিশ্চয়ই করবো। তার আগে, মাতা কুন্তী কে সংবাদটা দিয়ে আসি।"

-"আসার সময়, বাগান থেকে কিছু শাক-সব্জি তুলে এনো বোন। আমি ততক্ষণে ক্ষীর বানিয়ে ফেলি কিছুটা। গো-দুগ্ধ তো অনেকটা আছে, আর, সুগন্ধি তন্‌ডুলও আছে।"

-"আচ্ছা দিদি, আনবো।"

কিছুক্ষণ পরে, -"কৃষ্ণা, শুনেছো ? ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ আসছেন আজ। ওর জন্য যদি পারো তো ছাপান্নভোগ

বানাও। কতদিন পর মাধব আসছে! কতদিন পর আমি দেখবো ওকে !"

-"মা, আমি একা ছাপান্ন ভোগ করতে পারবো ? বোন সুভদ্রা যদি সাহায্য করে তো খুব ভালো হয়! "

-"অবশ্যই কৃষ্ণা। তুমি একা করতে কষ্ট পাবে বলেই তো আমি এলাম। আমি, সুভদ্রা দুজনেই তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি আমার শুধুই পুত্রবধু নয়, আমার কন্যাও বটে। শুধু আমার একটা ভুলে, তোমার জীবনটা চির অসুখী হয়ে গেলো পুত্রী। এ অপরাধ আমাকে কোনদিন শান্তি পেতে দেবে না।"

-"থাক মা, আজ এসব কথা থাক।" কৃষ্ণা অস্ফুটে বললো। তারচোখদুটো আরক্ত। উনানের আগুনে, না কি যন্ত্রণায় বোঝা গেলো না।

-"এই নাও দিদি, বাগান থেকে কিছু সব্জি তুলে আনলাম। কিছু মরিচ,বার্তাকু, কদলি, সর্ষপ পত্র, মূলকা, পটল, শুকনো কিছু মূলকা পুষ্পও এনেছি তুলে। তুমি ভাজা ভালো বানাতে পারো দিদি।"

-"বাঃ, খুব ভালো। ঝুড়িটা নীচে রাখো।"

-"একি দিদি তুমি কাঁদছো ? চোখ তোমার আরক্ত, ধরা ধরা গলায় কথা বলছো !"

-" উনানের আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি বোন।মাতা কুন্তী, আপনাকে এই গরমে, এখানে থাকতে হবে না। আপনি ঘরে গিয়ে বরং বিশ্রাম নিন।সুভদ্রা আমাকে সাহায্য করলেই হবে।"

-"হ্যাঁ মাতঃ, আমরা দুই বোন, রন্ধন সমাপ্ত করতে পারবো।আপনি বিশ্রাম করুন।" সুভদ্রা বলে উঠলো।

-" বেশ তবে আমি যাচ্ছি, যদি প্রয়োজন হয় তো ব'লো।" বলে কুন্তী প্রস্থান করলেন।

-"বোন সুভদ্রা, সব্জি গুলো জলে ভালো করে ধৌত করে, ছোট ছোট টুকরো করে ফেলো। আমার ক্ষীর প্রস্তুত হয়ে গেছে, এবার আমি শিম্বি অন্ন প্রস্তুত করবো।"

-"নিশ্চয়ই দিদি, সব্জি গুলো আমি কেটে দিচ্ছি। কোন্ শিম্বি আজ বানাবে দিদি?" সুভদ্রার কৌতুহলী প্রশ্ন ছুটে এলো কৃষ্ণার দিকে।

-"সখা কৃষ্ণ, অরহড় শিম্বি বেশি পছন্দ করেন। তাই, ওটাই বানাবো আজ।" বলে দ্রৌপদী হাসি মুখে তাকালো সুভদ্রার দিকে।

সুভদ্রা দেখলো, সেই হাসিতে লেগে আছে তীব্র অভিমান, নীরব অভিযোগ, চাপা যন্ত্রণা আর হাল্কা পরশ্রীকাতরতা। সুভদ্রার কেমন করুণা হলো। সে চোখ নামিয়ে নিল। দ্বার প্রান্তে শোনা গেলো তৃতীয় পাণ্ডবের গলার স্বর

-" কি অপূর্ব সুঘ্রাণ! আমাকে টেনে আনলো এ স্থানে। তাই বলি, কৃষ্ণা রন্ধন করছেন, তাহলে তো একে একে সবাই এসে উপস্থিত হবেন এই রন্ধনের সুঘ্রাণে। ওই, ভ্রাতা ভীম হাজির হলেন বলে।"

"ভাশুরের নাম শুনে এতো আড়ষ্ট হতে হবে না সুভদ্রা, উনি পরিহাস করছেন।" দ্রৌপদী গলায় ব্যঙ্গের ঝাঁঝ তুলে বলে উঠলো। অর্জুন বুঝলেন, রন্ধনশালার গরম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। তাই, তাড়াতাড়ি সরে গেলেন

অন্যত্র। সুভদ্রা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিলো কৃষ্ণা দিদিকে। তার পর, পরিবেশটা স্বাভাবিক করতে, বলে উঠলো, -"দেখুন তো দিদি, ঠিক ঠাক করতে পারছি তো?"

-"হ্যাঁ বোন, যা করছো , সেটাই ঠিক হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি তো সখার সাথে ছোটবেলা থেকেই একসাথে বড় হয়েছো। সখা কৃষ্ণ, কি কি ভোগ পছন্দ করে, আমাকে বলে দিও তো। আমি, সেগুলো বানানোর চেষ্টা করবো। যা পারবো। উনি তো মৎস্য আহার করেন না, আমি মৎস্যরন্ধনও করতে পারি।"

-"না না দিদি, ভ্রাতা কৃষ্ণের ভোজন, সম্পূর্ন নিরামিষ। নিরামিষ রন্ধন করুন। আর, উনি একটু মধুর স্বাদের রন্ধন বেশি পছন্দ করেন। মিষ্টান্ন তো বটেই।"

-"তন্ডুল কি বানাই বলোতো বোন ? সুগন্ধি সীতাশাল না কি সুগন্ধি কৃষ্ণভোগ ? দুটোই পর্যাপ্ত আছে এখন।"

সুভদ্রা বেশ খুশিই হলো দ্রৌপদীর ব্যবহারে, যে, তাকে প্রাধান্য দিয়ে দিদি কথা বলছে।

-"দিদি, আমি বলি কি দুটোই বানান।সুগন্ধি তন্ডুল কৃষ্ণভোগ, সব্জি-শিম্বি সহ পরিবেশন করুন আর, সুগন্ধি সীতাশাল চালের নিরামিষ ঘৃতান্ন পরিবেশন করুন আলাদাভাবে।"

দ্রৌপদীর পছন্দ হলো সুভদ্রার কথা। মাতা কুন্তী পুনরায় দেখতে এলেন দুই কন্যা সমা পুত্র বধূদের। দুজনকে কথা বলতে দেখে খুশিই হলেন, নিশ্চিন্ত হলেন দুজনের মিলমিশে। সংসারে শান্তি রাখতে, দুই সতীনের ভাব খুব

প্রয়োজন। -"কি কি ভোগ রন্ধনের আয়োজন করবে বলে ঠিক করলে কৃষ্ণা? তোমার হাতে বানানো রন্ধনের তো তুলনাই চলে না। যা বানাবে, তাই অমৃত। মা সুভদ্রা, তুমি দিদির কাছে শিখে নাও। "

দ্রৌপদী একটু হেসে শ্বশ্রূমাতাকে জানালো- "মাতঃ, সুভদ্রা যা আয়োজন নিয়ে এসেছে, তাতে আমি পদ হিসাবে রন্ধন করতে পারবো,- সর্ষপ পত্রের ভাজা, অড়হড় শিম্বি, শুকন- পুষ্পের ভাজা, মূলকের চচ্চড়ি, শুকনের ছেচকি, ঘৃতান্ন, পটলের দোলমা, মুগ শিম্বির বড়ার ডানলা, আমের চাটনি, খাঁটি গো-দুগ্ধের ঘি, দধি, মাখন, কাঁঠাল দানার পায়েসভোগ আর ক্ষীর সহ ছাপান্ন ভোগ। ফল, লাড্ডুর যোগে তৈরী হতে পারে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজন। পঞ্চপাণ্ডবের সন্মান আমি বজায় রাখবো মাতঃ।"

-"জানি মা, তুমি চিরকাল নিজের কথা না ভেবে পঞ্চ পান্ডবদের সন্মান ও আনন্দের কথাই ভেবে এসেছো। তুমিই, হলে ওদের সবার সুযোগ্যা সহধর্মিনী, উপযুক্ত সঙ্গিনী। আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ কৃষ্ণা। আমি যাই, অন্য আয়োজন কেমন হলো দেখে আসি। তোমরা দুইজনে রন্ধন সাঙ্গ করেফেলো।"

রন্ধনের মাঝে চললো, দুই সতীনের চুটিয়ে আলাপ।

-"এর আগে,দিদি, তোমার সাথে এতো কথা হয় নি। তোমাকে আমার বেশ ভয় করতো।"

-"কেন ? ভয় করতো কেন? তাও আমাকে? "

-"হ্যাঁ দিদি, তুমি তো খুব গম্ভীর । তাই, দেখে রাগী বলে মনে হতো। ভয় করতো, যদি ভুল কিছু বলে দিই, আর তুমি রেগে যাও। "

-"এখন সে ভয় করছে না তো ?"

-"আগের মতন করছে না। তবে তোমার মধ্যে এখন আমি আমার জন্য যে সহোদরা সুলভ স্নেহ দেখেছি, তাতেই ভয় কেটে গেছে। "

-"তুমি সখা কৃষ্ণের মতোনই কথা বলো বোন। আর বলবে নাই বা কেন, তুমি তো তার আপন সহোদরা ভগিনী।"

সুভদ্রা হাসি মুখে মাথা নীচু করে নিলো।

-"আচ্ছা বোন সুভদ্রা, তোমার পিতা তো স্বয়ং বসুদেব কিন্তু মাতা তো দেবকী দেবী নয়? মাতা দেবকী তো শুধু সখা কৃষ্ণের মাতা।"

-"হ্যাঁ,দিদি। আমি আর দাদা বলভদ্রদেব, মাতা রোহিণী দেবীর গর্ভজাত সন্তান আর আমাদের দুই জনেরই পিতা হলেন বসুদেব। ভ্রাতা কৃষ্ণ, পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী দেবীর সন্তান। আমরা সবাই একসাথে নন্দ রাজা আর মাতা যশোদার কাছে পালিত- পালিতা। কারণ, আমাদের পিতা বসুদেব মাতা দেবকী সহ মাতুল কংসের কারাগারে বন্দী ছিলেন। সে কাহিনী তো দিদি শুনেইছো পূর্বে।

-"হ্যাঁ শুনেছি সখা কৃষ্ণের কাছে। এও শুনেছি, তৃতীয় পাণ্ডব তোমাকে, সখার বাটিকাতে দেখেই, আকৃষ্ট

হয়েছিলেন তোমার প্রতি। সখারই সহায়তায় তোমাদের বিবাহ হয়।"

"হ্যাঁ দিদি। আকৃষ্ট আমিও হয়েছিলাম তৃতীয় পাণ্ডব কে দেখে। বহুবৎসর পর দেখা তো। প্রথম যৌবনে পা রেখে, আমরা দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। আর, ভ্রাতা কৃষ্ণ যদি সহায়তা না করতেন, কি যে হতো! ভ্রাতা বলভদ্রদেব তো আরেকটু হলেই আমার বিবাহ ওই দুষ্ট দুর্যোধনের সাথে দিয়ে দিচ্ছিলেন! "

- "তাহলে আর কি হতো ! তোমার প্রেমিক আর স্বামীর মধ্যে যুদ্ধ হতো। যেই জিৎ অর্জন করুন না কেন, তোমার কপালে অশ্রু বর্ষণ লেখাই থাকতো।" বলে, দ্রৌপদী নিজের মনের জ্বালাকে, আড়াল করে নিল হাস্য রসিকতায়। সুভদ্রা তা বুঝতে পেরেছিলো কি? কে জানে।

সুভদ্রা হাসি মুখে বললো,-"অপরাধ নেবে কি দিদি, যদি আমি তোমার সম্পর্কে একটা কথা জানতে চাই?" -

দ্রৌপদী বললো, "আমার সম্পর্কে অধিক কি আর জানার আছে ? সবই তো, তৃতীয় পান্ডব আর সখা কৃষ্ণের কাছে শুনেছো।"

-"সে তো ইতিহাস শুনেছি। তোমার মন তো আর দেখি নি, শুনিনি। আমি সেটাই দেখতে চাই, শুনতে চাই, দিদি।" সুভদ্রা ভয়ে ভয়ে জানালো।

কৃষ্ণা, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মুখে বললো,--"হতে পারি আমি অগ্নি কন্যা, অগ্নি সম্ভূতা, তবু আমিও এক নারী। আমার হৃদয় চায়, প্রিয়তমের একনিষ্ঠ প্রেম,

একনিষ্ঠ হৃদয়, একনিষ্ঠ জীবনের অধিকার। কিন্তু, সমাজে কোন নারীরই সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবার নয়। নারী যেন বহুভোগ্যা পণ্যের মতন, ভোগ্যা জড়বস্তু। তাদেরও যে মন আছে, স্বপ্ন, চাওয়া পাওয়া আছে, ইচ্ছা আছে- তার কদর কে কবে করেছে! তাই, আজ আমিও, অগ্নি সম্ভূতা রাজকন্যা হয়েও, ভাগ্য বিপর্যয়ে, পঞ্চ পুরুষের ভোগ্যা। সেই কারণেই, দুর্যোধন, দুঃশাসন আমায় অপমান করতে সাহস দেখিয়েছেন। অথচ, অনেক আশা নিয়ে, রাজর্ষি পিতা দ্রুপদ আমার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন। তাও, আমারই পছন্দকে মান্যতা দিয়ে, ধনুর্যোজনার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তারপর, আমার ভালোলাগা-ভালোবাসা কোথায় মূল্য পেলো? তাই, কি হবে সে সব শুনে বোন ? তাছাড়া, হস্তিনাপুরের রাজসভায় আমি দেখে নিয়েছি, আমার জীবন ও ভালোবাসার দাম। পঞ্চস্বামীর একজনও আমার সত্যিকারের স্বামীর ভূমিকা পালন করতে পারেননি, চাননি তাই। শুধু, দ্বিতীয় পান্ডব আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন, আমাকে উদ্ধারের জন্য প্রতিবাদও করেছিলেন। বাকিরা সবাই, নীরব, নীরবই থেকেছেন, কারণ, কেউই আমাকে আপন ভাবেন নি, হৃদয়ে ধারণ করেন নি, আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব, সবাই অন্যের ভেবেছেন। এমনকি, যার হাত ধরে, আমি এই কুন্তী পরিবারে, পা রাখলাম, সেই প্রথম যৌবনের প্রথম ভালোলাগা, তিনিও সেদিন ভেবেছিলেন, আমি তো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও স্ত্রী, তাই আমাকে উদ্ধারের একমাত্র দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পান্ডবের। তাঁর নয়। এরকম নারী জীবনের

সন্মান ও ভালোবাসার কি মর্যাদা হতে পারে!" কৃষ্ণার আরক্ত দুই চোখ থেকে,নামতে লাগলো জলের ধারা।"

সুভদ্রা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, -"দিদি, নারী প্রেমের কোন স্বীকৃতি নেই জম্বুদ্বীপে। তাই, বহুবিবাহ চলছে স্বাভাবিক নিয়মেই। দিদি রাধিকাকেই দেখো না। জীবনটা ছারখার হয়ে গেলো, হয়তো পেয়েছে দয়িত, ভ্রাতা কৃষ্ণের হৃদয়, কিন্তু, স্বীকৃতি পেলো কি!"

-"ঠিকই বলেছো বোন। নারী জীবনের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, মর্যাদার, স্বপ্ন-আশা -আকাঙ্খার কোন মূল্যই আজ আর অবশিষ্ট নেই। পূর্বেকার দিনের, সীতা মাতাকেই দেখো, কতটা কষ্ট পেতে হয়েছে অকারনে! আমাদের মাতা, শ্বশ্রূমাতাকে দেখো, স্বামীর আদর, সন্মান, মর্যাদা পেলেও, একক অধিকার পাননি। আমাকেও, পঞ্চ পান্ডব সন্মান করেন, মর্যাদা দেন, অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু, আমি কি চাই, কাকে চাই,তা জানবার, বোঝবার প্রয়োজন মনে করেন নি। আমার যে আলাদা চাওয়া পাওয়ার জগৎ থাকতে পারে, তা ভাবতেই পারেন না কেউ। "

-"পূর্বে তো শুনেছি, নারীদের সন্মান ও অধিকারের কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। ভ্রাতা কৃষ্ণের কথায় জেনেছি, এখন সমাজ কিছুটা বুঝেছে। অথচ, ভ্রাতার কাছে শুনেছি, বহু পূর্বে, মানব সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। ভাবতে অবাক লাগে, তাহলে, আজ মেয়েদের, মা, শাশুড়িমাতা ইনাদের আজ এই অবস্থা কেন?"

-"আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, বোন, হরিণা বৈরী। মেয়েরাই, আপন স্বার্থে মেয়েদের শত্রু হয়ে উঠেছে।

সীতা মাতার জীবন তো ছারখার হয়ে গেল এক নারীর শত্রুতায়। জীবনটা তাঁর ধ্বংস হয়ে গেল তো সেই এক রাক্ষসী রমনীরই জন্যে । সামান্য ঘটনায় ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। আর, আমার জীবনের বিপর্যয় ঘটলো কোন পুরুষ নয়, এক নারী তাও মাতা কুন্তীরই নির্বুদ্ধিতায়। কি আর করা যাবে, এরই নাম বিধিলিপি বোন, কি আর বলব! "

-" দিদি দেখো গল্প করতে করতে তোমার রন্ধন প্রায় সমাপ্তির পথে। মাত্র, কাঁঠাল দানার পায়েসভোগ আর লাড্‌ডুর পাক বাকি। আমি লাড্‌ডুর পাক লাগাচ্ছি দিদি, আর তুমি কাঁঠাল দানার পায়েস বসিয়ে দাও।"

-" হ্যাঁ বোন, তার সাথে কিছু সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত করতে হবে। সখা এত দূর থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে আসবে, তৃষ্ণার্ত থাকবে, শীতল, সুগন্ধি, সুমিষ্ট পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করবে তো। তা তুমি বোন বাগান থেকে কয়েকটা গন্ধরাজ নিম্বু তুলে আনবে দেখেশুনে? আমি, মিছরি আর শীতল জলের সংমিশ্রণে তৈরি করে ফেলি পানীয়।"

-"হ্যাঁ দিদি, এখনি যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পর --" এই দ্যাখো দিদি, বাগান থেকে বড় বড় সুগন্ধি নিম্বু প্রায় আট-দশটা তুলে নিয়ে এলাম। সবকটাই রসে ভরা। দারুন পানীয় প্রস্তুত হবে। আর, এই দ্যাখো, দিদি, বেশ কিছু শ্বেত কমল পুষ্প তুলে আনলাম সরোবর থেকে, কিছু রক্তাভ কমল পুষ্পও আছে। এই দুই পুষ্পের সংযোগে আমি পুষ্প হার বানিয়ে দিচ্ছি, তুমি, নিজে হাতে তোমার সখাকে উপহার দেবে। ভ্রাতা কৃষ্ণ খুব খুশি হবেন।"

এভাবে কখন যে সুভদ্রা ও দ্রৌপদী ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলো, কখন যে আপনি আর তুমি সম্বোধন এক হয়ে গেলো, তা, তারা বুঝতেই পারলো না।দেখতে দেখতে সূর্য মাথার ওপর চলে এলো। কুন্তী সব দূর থেকে দেখে, মনে মনে ভাবলেন, -"একেই বলে, লীলাময়ের লীলা। আমার মনের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকা কালো মেঘটাকে কিভাবে সরিয়ে দিলেন!”

মাতা কুন্তী, দুই পুত্রবধু কে বললেন,--" কৃষ্ণের আসবার সময় হয়ে গেছে। তোমাদের রন্ধনও তো প্রায় সমাপ্ত। এবার তোমরা দুইজনে গিয়ে, স্নানান্তে পট্টবস্ত্র ও ভূষনে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও, কৃষ্ণ কে স্বাগত জানাতে হবে তো। লাড্ডু প্রস্তুতি আমি সমাপ্ত করছি। বাঃ, খুব সুন্দর মাল্য নির্মাণ করেছো কন্যা সুভদ্রা। এই মাল্য কৃষ্ণ কে উপহার দেব।"

-" মাতঃ, এই মাল্য দিদি তাঁর সখা কৃষ্ণ কে উপহার দেবে বলে আমি দিদিকে বানিয়ে দিয়েছি।"

কুন্তী সহাস্যে বললেন,--"তাই দিও। আর তুমি কৃষ্ণের পদযুগল ধৌত করে দিও, বাগানের ওই কূপের শীতল জলে। কেমন ? আমি লাড্ডুগুলো পাকিয়ে ফেলি।"

দুই সতীন চলে গেলো প্রস্তুত হতে আর মাতা কুন্তী কৃষ্ণ নাম স্মরণ করতে করতেই, ঘৃত ও বাদাম সহযোগে, বানিয়ে ফেললেন ,লাড্ডুর সম্ভার সবার জন্য।
পঞ্চপান্ডব প্রধানদ্বারে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সখা ও ভ্রাতা কৃষ্ণের জন্য। হঠাৎ, রথচক্রের শব্দে প্রাসাদে হৈ-হৈ পড়ে গেলো- বাসুদেব কৃষ্ণ পদার্পণ করছেন। একে একে সবাই এসে দাঁড়ালো। পুষ্প বৃষ্টি তে স্বাগত জানিয়ে

তৃতীয়পাণ্ডব হাত ধরে রথ থেকে নামিয়ে নিলেন বাসুদেবকে। সবাই চারপাশে জয়ধ্বনি করে উঠলো- "জয়, মথুরা নরেশের জয়"। স্মিত হেসে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে মাধব, এগিয়ে চললেন প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদ দ্বারে কৃষ্ণা পদ্ম মাল্য গলায় পরিয়ে,বরণ করে ভিতরে আনলেন সখাকে। মাতা কুন্তী কে প্রণাম জানিয়ে কৃষ্ণ,পা রাখলেন অন্দরমহলে। সহোদরা সুভদ্রা, হাসিমুখে এসে, ভ্রাতার পদ ধৌত করে দিলো। সুভদ্রার হাসি মুখ দর্শনে কৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। কৃষ্ণা ততক্ষণে নিয়ে এসেছে শীতল পানীয় কর্পূর ও পুদিনা পাতা সহযোগে। কৃষ্ণার বানানো পানীয়, কৃষ্ণের সকল পথ ক্লান্তি দূর করে দিলো। চললো কুশল বিনিময় ও হাল্কা বাক্যালাপ।

-" মাতা কুন্তী, এই সিন্দুকে আছে সবার জন্য বস্ত্র ও আভূষন। এটি উপহার স্বরূপ আপনাদের জন্য, আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন ,মাতা দেবকী। মাতা দেবকী খুবই প্রীত হবেন, যদি আপনারা এগুলো গ্রহণ করেন।"

-" বোন দেবকীর শরীর এখন কেমন ? শুনেছিলাম অসুস্থ। এখন উত্তম তো ? ভ্রাতা বসুদেব কেমন আছেন?" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, দেবী কুন্তী, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন উত্তর শোনার জন্য।

-"সবাই কুশলেই আছেন, আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না মাতা কুন্তী।" কৃষ্ণ, তাঁর পিসিমা কে সান্ত্বনা দিলেন।

কিছুক্ষণ এভাবে হাসি খুশি গল্পে কাটানোর পর, কুন্তী কৃষ্ণ কে নির্দেশ দিলেন -"যাও পুত্র, স্নানাহার সমাপন করে, একটু বিশ্রাম নাও। "

-" চলো কৃষ্ণ,ছোটবেলার মতোন আমরা সবাই একসাথে, আমাদের উদ্যানের পদ্ম- সরোবরে সন্তরন ক্রীড়ায় মেতে উঠি। তোমার আপত্তি নেই তো?" তৃতীয়পাণ্ডব প্রস্তাব রাখলো।

-" আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না ভ্রাতা।" উচ্ছ্বল কন্ঠে বলে ওঠেন কৃষ্ণ। -"সখী কৃষ্ণা, তোমার বানানো পানীয় আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে। এখন আমি পুরোপুরি প্রস্তুত সন্তরন ক্রীড়ায়। তুমি আমাকে সমর্থন করবে তো? না কি, তৃতীয় পাণ্ডব কে করবে?" বক্র হাসিতে প্রশ্ন রেখে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীর মনের অবস্থা বুঝতে তৎপর হলেন।

নির্দ্বিধায় দ্রৌপদী উত্তর দিলো,--"সখা, এতো বোকা আমি নই, যে তোমাকে অস্বীকার করে আর কোন পুরুষকে সমর্থন করবো। সেদিন হস্তিনাপুরের রাজসভায়, একমাত্র তুমিই আমার লাজ রক্ষা করে,আমাকে তোমার কাছে চির ঋনী করে নিয়েছো। আমি ভুলিনি, কোনদিন ভুলবো না সখা, কোনদিন না। আজীবন, সব সময়, আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকবো। তোমাকেই সমর্থন করবো প্রভু।"

কৃষ্ণ আড়চোখে দেখে নিলেন,পঞ্চ পান্ডব সহ মাতা কুন্তী অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সুভদ্রা, অন্দর মহল থেকে ছুটে এলো, চন্দন আর হলদি সহ, গো- দুগ্ধ,

গোলাপ পাপড়ি দিয়ে সাজানো প্রলেপ, রূপার বাটিতে নিয়ে।

-"ভ্রাতা, এই প্রলেপ সহ তুমি স্নান সেরে নাও। দিদি কৃষ্ণা, তোমার জন্য নিজের হাতে ছাপান্ন ভোগ রন্ধন করেছেন, যার প্রতিটি পদই সুস্বাদু হয়েছে। দিদির হাতে তৈরি ।"

-"তাহলে তো আর সময় নষ্ট করলে চলে না, বোকামী হবে। তাছাড়া, আমার সখী কৃষ্ণা যে রন্ধনের মধ্যে দিয়ে অমৃত পরিবেশন করে, তা আমি জানি। তাই, সময় অপচয় করা একেবারেই ঠিক হবে না।"

বলে কৃষ্ণ,পরিবেশটা সহজ করে দিয়ে বাটি নিয়ে স্নানে গেলেন। স্নানের সময়, অর্জুনসহ পঞ্চ পান্ডব কৃষ্ণ কে, নিজেদের হাতে প্রলেপ লাগিয়ে কৃষ্ণ-সেবা সেরে নিলো। তারপর চললো, কৃষ্ণের সাথে সন্তরন ক্রীড়া। পরিতৃপ্ত স্নান ও কৃষ্ণার হাতে বানানো ছাপান্ন ভোগ, সবাই একসাথে বসে, হাস্য পরিহাস যোগে সমাপন করলেন। সুভদ্রা ও দ্রৌপদী পরিবেশন করলো একসাথে, মিলে মিশে। দেখে, কৃষ্ণ নিজের বোন আর সখীর জন্য গর্ব বোধ করতে লাগলেন। সুভদ্রার প্রতি স্নেহ ও সখী কৃষ্ণার প্রতি প্রীতি তাঁর, আরো বেড়ে গেলো। তিনি বুঝলেন, তাঁর আসবার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আকাশে একটা-দুটো তারা ফুটে উঠতে লাগলো।

কৃষ্ণ, দিবানিদ্রা সেরে, পঞ্চপান্ডবদের সাথে পাশা খেলা নিয়ে বসেছেন আর টুকটাক রাজনীতির কথা বলছেন। দ্রৌপদী আজ খোলা কবরী এলিয়ে বসে আছে ঘরের বাইরে। সন্ধ্যা দীপ জ্বেলে সাজিয়ে চলেছে পুরো প্রাসাদ। তার আরাধ্য এসেছেন,তাই, আজ তার দীপান্বিতা।

আলোয় ঝলমল করবে পুরো প্রাসাদ। ইমন রাগের সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। সভা গায়কের অপূর্ব গায়কিতে হৃদয় ভরে উঠেছে। সেই সঙ্গীতেরই মূর্ছনা উঠেছে কৃষ্ণার গলায়, হৃদয়ের অতল থেকে।
সুভদ্রা এসে বসে পড়লো কৃষ্ণার পাশে। কৃষ্ণের হৃদয়-মন ভরে উঠেছে সখীর গানে সখীর ভক্তিপ্রণত আনন্দে। বিভোর সুভদ্রার হুঁশ ফিরল কৃষ্ণার কথায়।

-" বাহিরে কেন বোন ? ঘরে গিয়ে বসো, শীতল হাওয়ায় শরীর খারাপ হতে পারে। "

-" না দিদি, কিচ্ছু হবে না। তোমার প্রেম গীতি ও ভক্তিতে আমরা সবাই আপ্লুত হয়ে পড়েছি। বিশেষ করে, এই সঙ্গীত আমার সখী রাধাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।" কৃষ্ণা হাসলো।

-"সুভদ্রা, তোমার কথা বলো। অনেক ক্ষণ আমার কথা হয়েছে।"

-" আমার কথা, আমি যতটুকু জানি, আমরা যাদব বংশীয়। যাদব বংশীয় শূরসেনের পুত্র বসুদেব আমার পিতা। তিনি ছিলেন বৃষ্ণি গোষ্ঠীর রাজা। ওনার আরেক নাম ছিল,আনাকাদুন্দুভী। হয়তো এটা অনেকেরই শোনা নেই যে, আমার পিতা বসুদেবের মাতা ছিলেন ভোজ বংশীয় রাজকন্যা। পিতা বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিনী হলেন আমার মাতা ও আমাদের পালিতা মাতা যশোদার ভগিনী। আমি ও দাদা বলভদ্রদেব, মাতা রোহিনী ও পিতা বসুদেবের সন্তান। ভ্রাতা কৃষ্ণ, পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর সন্তান। মাতা দেবকী ছিলেন, যদু রাজবংশের রাজা দেবকের কন্যা। দেবকের মৃত্যুর পর তিনি

দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনের কাছে বড় হন।কংস, যিনি দেবকীর মাসতুতো ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই পরে আমার পিতা বসুদেব কে ও মাতা দেবকী কে বন্দী করেন। এখন, সেই কংসমামাকে হত্যা করে, ভ্রাতা কৃষ্ণ আমাদের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে উদ্ধার করে, মথুরার রাজা হয়েছেন। এসব তো তুমি শুনেছো দিদি। "

"-হ্যাঁ, বোন কিছুটা শুনেছি।" দ্রৌপদী জানালো।

-" তুমি পাশা খেলা জানো ? চলো আমরাও পাশা খেলি সখার সাথে।"

-" না বাবা! ভ্রাতা কৃষ্ণ, আমার ওপর রেগে যেতে পারেন। তার চেয়ে তুমি খেলো, আমি দেখি।" সভয়ে সুভদ্রা জানালো।

সেদিন সন্ধ্যা জমে উঠলো জুয়া বিহীন পাশা খেলার নিখাদ আনন্দে। সুভদ্রা, তার স্বামী কে, দ্রৌপদীর ব্যাপারে নিরুত্তাপ দেখে, ভয় পেলো, একদিন এভাবেই কি তার ব্যপারেও নিরুত্তাপ হয়ে যাবেন তৃতীয় পাণ্ডব! শুধু, মোহ কাটার অপেক্ষা! সভয়ে, প্রাণপণে ধরে থাকতে চাইলো গর্ভস্থিত সন্তান কে। সেই তো তখন তার একমাত্র ভরসা, আর একমাত্র সম্বল হবে। কৃষ্ণ কি বোনকে একবার আড়চোখে দেখে নিলেন ? আড়চোখে দেখে নিলেন ভবিষ্যতকে। সুভদ্রার জন্য হৃদয়ের কোথাও কি ব্যাথা জেগে উঠলো তাঁর ? সুভদ্রার মস্তকে অজান্তেই স্নেহের হাত রাখলেন বাসুদেব। যেন বলতে চাইলেন -"আমি তো আছি।"

অপরাহ্ন কথা

__________ অপরাহ্নের ম্লান আলোকের শেষ ছ্বটা, বাতায়নের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হুটোপুটি করে খেলছে।

-" মাতঃ, আপনি সুসজ্জিতা হয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?"

-" পুত্র, এই দেশের রাজরানী এসেছেন। উনি সম্পর্কে আমার জেষ্ঠ্যা ভগিনী। তোমাদের জেষ্ঠ্যা মাতা উনি। আমি, ওনার সাথে একটু দেখা ও আলাপচারিতা সেরেআসি। তোমরা ততক্ষণে তোমাদের ক্রীড়া- অঙ্গনে যাও পুত্র।"

"আমরা ওনার কাছে যাবো না ?"

-"নিশ্চয়ই যাবে পুত্র, তবে এখন নয়, পরে।"

পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র অঙ্গদ ও ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র ধর্মকেতু হাত ধরে, প্রস্থান করলো। দেবী উর্মিলাও, ভগিনী সীতার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। দাসী এসে সীতা দেবী কে জানিয়ে গেলো, উর্মিলা দেবীর আগমন বার্তা।

-"দিদি সীতা, কাল তুমি কতদিন কতবছর পর, অযোধ্যা নগরীতে ফিরে এলে।কালকেই খুব ইচ্ছে করছিলো, তোমাকে আলিঙ্গন করি, তোমার সাথে, আবার সেই বিবাহ পূর্বজীবনের মতোন, সব গল্প করি। কিন্তু, সবাই

কাল তোমাকে পেয়ে, কাছ ছাড়া করছিল না। তাই, কালকের দিনটা কোনরকমে কাটিয়ে, আজই ছুটে এলাম তোমার কাছে।"

-"এসো বোন, আমার তোমাকে অনেক কথা বলার আছে, জানার আছে। এসো, আবার, আগের মতো, দুজনে, সুখ-দুঃখের সব কথা মন খুলে বলে নিয়ে, মনটাকে হাল্কা করি।"

একথা বলে সীতা দেবী বোন উর্মিলা কে, গাঢ় ভালো বাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। রক্ত রাগের পোষাকে আর স্বর্ণ অলঙ্কার সজ্জায় তাঁকে দেখতে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা লাগছিল।

-"একি বোন, তুমি এতো বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ ও কৃশকায় হয়ে গেছো কেন ? ভ্রাতা লক্ষমন তো এসে গেছেন তোমার কাছে। এখনতো আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠো। এখনতো সাজসজ্জায় ভরে ওঠো।" বলে, সীতা, পরম স্নেহে ও যত্নে ছোটবোনকে নিজ আভরনে সাজিয়ে দিতে থাকলেন।

-"এ অলঙ্কার কি বিচিত্র দেখতে ! খুব সুন্দর এবং অদ্ভুত। কে দিয়েছে এই অলঙ্কার ? কোথা থেকে পেলে এসব? আমাদের দেশের নয় বলেই তো মনে হচ্ছে।"উর্মিলা, সীতার পরানো মাল্যটা হাতে ধরে বলতে লাগলো।

-"হ্যাঁ বোন, এই মাল্য আমায়, সখি সরমা ভালোবাসার উপহার হিসেবে দিয়েছেন,যাতে আমি ওঁকে চিরকাল স্মরণে রাখি।"

-" কি বলছো দিদি! সেই সুদূর লঙ্কায়, রাক্ষস রাজ্যে, তোমার সখি! রাক্ষসরা কখনো মানুষের বন্ধু হয় ?"

-"বোন, রাক্ষস সে ছিল বাহিরের চেহারা আর জাতিগত বিচারে। মনের দিক থেকে সে ছিল আমার পরম আপন জন, কতকালের চেনা সখি। কারোর বন্ধুত্ব জাতিগত ভাবে বিচার করতে নেই বোন, বিচার করতে হয় মানবিকতার নিরিখে। কাউকে, বাহিরের চেহারা ও আকার-আকৃতি দিয়েও বিচার করতে নেই। বিচার করতে হয় তার মনের সৌন্দর্য দিয়ে। আর, সে বিচারে, বিভীষনপত্নী সরমা ছিলেন দেবীতূল্যা। আমি ওই বন্দী জীবনে, ওকে আমার সখি হিসাবে পেয়ে ধন্য হয়েছি। এই সখ্যতা, ভগবানের দেওয়া আমাকে পরম আশীর্বাদ।"

উর্মিলা দেখছিলো, দিদির এক অন্য রূপ, যে রূপ যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে অভিজ্ঞতার স্বর্ণ প্রলেপে আরো জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে।

-"বোন, পিতা জনক রাজা আসবেন না আমার সাথে দেখা করতে ? পিতা এখন কেমন আছেন ?"

-"নিশ্চয়ই আসবেন। পিতা সংবাদ পাঠিয়েছেন, খুব শীঘ্রই পিতা, মাতা সুনয়নাকে, সাথে করে অযোধ্যায় আসছেন।" "কতদিন পর আমি দেখবো আবার সবাইকে।"

-"হ্যাঁ দিদি, জানো, শুনেছিলাম, তোমার রাক্ষস দেশে অপহৃতা হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে, পিতা খুব অসুস্থ,

মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অনেক বৈদ্য-কবিরাজ করে, ধীরে ধীরে সুস্থ করা হয়েছে।"

-"আচমকা যে কি ঘটে গেলো ! বেশ তো আনন্দেই কাটছিল আমাদের বনবাস জীবন। সবই ঘটলো আমার ভুলে।"

-"একেই হয়তো, নিয়তি বলে দিদি।"

-"তাই হবে। নয়তো ওভাবে লোভ আর পাপ চেপে বসলো কেন আমার মনে ? ভ্রাতা লক্ষমন, নিষেধ করার পরেও, সুরক্ষা গন্ডী পার করলাম কেন ? কি যে মতিভ্রম হলো! আমি যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তখন।"

-" দিদি, রাক্ষস জাতি মায়া জানে। ওই দুষ্ট রাবন তোমায় বশীভূত করে তোমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।" -"হয়তো তাই। আচ্ছা বোন, তুমিও কি আমার নারীত্বের সুরক্ষা বিষয়ে সংশয় করো? এখানকার সবাই সত্যি কি ভাবে, আমাকে জানাও বোন।"

-"মানুষের মন অতি বিচিত্র। মনের মধ্যে কে কি ধারণা করে রেখেছে,সে ভগবানের অসাধ্য জানা। তবে, আমার মতে, শরীর আর আত্মা পৃথক দুটি সত্ত্বা। শরীরের ওপর গায়ের জোর চলে, কিন্তু মনের ওপর ,জোর চলে না, আর সেই মনের ঘরেই প্রেম- ভালোবাসার বাসা। তোমার মনে শ্রী রামের প্রতি যে ভালোবাসা,তাকে কলুষিত করার ক্ষমতা ভগবানেরও নেই, রাবন তো কোন ছার। সে অধিকার একমাত্র তোমারই। শরীর স্পর্শ করে রাবন,

তোমাকে কলুষিত করেছে, একথা তাই কখনোই সত্য হতে পারে না।"

-"লঙ্কেশ আমায় হরন করে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। আমার শরীর ভোগের জন্য নয়। একথার প্রমাণ অগ্নি দেব দিয়েছেন। তাছাড়া, লঙ্কেশ রাবনকে, তার ব্রাহ্মনত্বের নিয়মরক্ষার ও শুদ্ধতার জন্য দেবতারাও শ্রদ্ধা করতেন, ভয় করতেন বলেই শুনেছি। তিনি আমাকে ভয় দেখাতেন, বিবাহ করবেন বলে। ভয় দেখাতেন রাম আসবেন না বলে। কিন্তু, আমাকে ভোগের ইচ্ছা যদি ওনার থাকতো, তাহলে তিনি তা, শুধু শুধু ফেলে রাখতেন না। আমি দেখেছি, তিনি তার মহিষীদের যথেষ্ট ভালোবাসতেন।বিশেষ করে মন্দোদরীকে। রানী মন্দোদরী, আমায় কন্যাবৎ, স্নেহ করতেন। আমি বয়সে ছিলাম, ওনাদের সন্তানতূল্যা। আসলে, তিনি শুনেছিলেন যে, আমার স্বামী নারায়নের অবতার। সেই কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য, আমাদের মধ্যে কার ভালোবাসার দৃঢ়তা বেশি, তা পরীক্ষার জন্য, সর্বোপরি, দেশের অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য রাবণ আমাকে হরন করে বন্দী করে রেখেছিলেন। সত্যি তো, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ছিল সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া? একাজ কেবল শ্রীরামের পক্ষেই সম্ভব । তাও, ভক্ত বন্ধু হনুমান ছাড়া কিভাবে সম্ভব হতো ? অসম্ভব ছিল। তাই নয় ?"

-" দিদি, ওনার কি দায় পড়েছিলো দাদা রামের অবতারত্ব প্রমাণের ? তোমাদের ভালোবাসার গাঢ়ত্ব প্রমাণের ? আর, দেশের অপমানের বদলা নেওয়ার প্রসঙ্গটা কি ?"

-" পিতা জনক যখন আমার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন, তোমারমনে আছে হয়তো, পিতা শিবধনুষ তোলার শর্ত রেখেছিলেন।"

-"হ্যাঁ, মনে আছে তো। সেই ধনুষ, কেউ তুলতে পারেন নি। শুধু মাত্র রাম দাদাই পেরেছিলেন।"

-"সেই স্বয়ম্বর সভায়, সবার সাথে লঙ্কেশ রাবনও ছিলেন। উনি গিয়েছিলেন, আমাকে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্যে নয়, উনি গিয়েছিলেন, শিবধনুষ দেখতে ও তার শক্তির পরীক্ষা করতে। ওনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উনি শিবের শক্তিকে পরাজিত করতে পারবেন শিবের ধনুষ তুলে। কিন্তু, তিনি তা পারেন নি। পরাজিত হয়েছিলেন শিবের কাছে, পরাজিত হয়েছিলেন প্রভু রামের কাছে। এ তাঁর আত্মাভিমানে প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল। আমাকে বিবাহ করে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়া হলো না, এ অপমানের চেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছিলেন সেদিন, নিজের শক্তির পরাজয়ে। সেই অপমানের জ্বালার ওপর, যখন, ভ্রাতা লক্ষমন, রাবনের ভগিনী সূর্পনখার নাক কান কেটে লঙ্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলো, সূর্পণখা আমায় মারতে এসেছিলো বলে, তখন সে সংবাদ শুনে রাবণ আর স্থির থাকতে পারেন নি। সূর্পনখার এ হেন অপমান, লঙ্কার অপমান বলে ধরে নিলেন। তাঁর মতো শক্তিধর লঙ্কেশ থাকতে, লঙ্কেশের ভগিনীর অপমান হবে, তাও একজন তুচ্ছ মানবের হাতে, এ রাবনের আত্মসম্মানকে টলিয়ে দিয়েছিল। আর, তারই প্রতিশোধের আগুনে উন্মত্ত হয়ে লঙ্কেশ , তুচ্ছ মানব রাম- লক্ষমনকে শাস্তি

দিতে,নিজের শক্তির আস্ফালন করতে,আমায় তুলে নিয়ে গেলেন সুদূর লঙ্কায়।"

-"এ সবই আসলে প্রচ্ছন্ন এক রাজশক্তির আত্মদম্ভের লড়াই এর পরিণাম।"

-"হ্যাঁ উর্মিলা, আর, আমরা নারীরা বিশ্বাস করে থাকি প্রেমের অস্তিত্বের টানকে। নয়তো, আমায় অগ্নি দহনের মধ্যে দিয়ে পবিত্রতার পরীক্ষা দিতে হতে হবে কেন ? এতো দিনের বিরহ দহন কি পর্যাপ্ত ছিল না ?"

-"দাদা রাম, তোমাকে এতোটুকুও অবিশ্বাস করেন না দিদি, কিন্তু, রাজ্যের মানুষ যাতে তোমায় সেই শ্রদ্ধা দেন, এতোটুকুও অবিশ্বাস না করেন, সেই আদর, সেই সন্মান ,সেই শ্রদ্ধার সাথে,যাতে তুমি দেশবাসীর কাছে বরণীয়, গ্রহনীয় হতে পারো, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই পরীক্ষা তোমাকে দিতে বলেছিলেন। দিদি, অভিমান হওয়াটা, তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু, তিনি দেশের রাজা, দেশের প্রতিনিধি। তুমি তাঁর যোগ্যা সহধর্মিনী - উনি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমার পরীক্ষা নিয়েছেন।"

সীতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস অস্তরাগে মিলিয়ে গেলো।

-"আচ্ছা দিদি, রাক্ষসদের দেশটা কেমন ? ঘন জলা-জঙ্গল আর গাছপালায় ভরা ? ওদের গৃহ কেমন? সাজসজ্জা কেমন? খাদ্য বস্ত্র কেমন? আমায় বলো ওদের দেশের কথা।"

সীতা ম্লান হেসে সস্নেহে বোনকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "ওদের দেশে কি আমি মুক্ত ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি যে সব দেখবো বোন ? আমি তো বন্দীনী।

তবে, যেটুকু দেখেছি ও শুনেছি তোমায় জানাচ্ছি। ওদের নগর রাজপ্রাসাদ খুব উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সভ্য। রাবণের উড়ান, যেটাতে করে রাবন আমায় হরন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই উড়ান উড়ে চলে যন্ত্রের সাহায্যে। দিক পরিবর্তনও করে যন্ত্রের মাধ্যমে। রাবণের পুস্পক উড়ানে করে, আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন নীচে আকাশ, মেঘ, আর ওপর দিয়ে আমি উড়ে চলে গেলাম। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। নীচে কি আছে, কি হচ্ছে , কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই আমার যাওয়ার পথ যাতে প্রভু খুঁজে পান, সেই চিন্তায়, আমার গহনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলাম পথনির্দেশের জন্য। হঠাৎ দেখলাম, নীচে গাছপালায় ভরা, তটভূমি দেখা যাচ্ছে।

লঙ্কেশ বললেন, "আমার সোনার লঙ্কা এসে গেছে।"

নীচে দেখি, লঙ্কার রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে জলপরিখা ঘেরা। যন্ত্রের সাহায্যে প্রবেশ দ্বারখুলে গেলো। উড়ান এসে নামলো লঙ্কার পথে। চারিদিকে কি বিশালাকায় মনুষ্য মূর্তির সারি। অদ্ভুত দর্শন সব মানুষ। ঘোর কৃষ্ণকায়। বিশাল সুগোল পিঙ্গলবর্ন চক্ষু, মোটা মোটা ঈষৎ রক্তাভ দন্ত। লোমশ শরীর। কেশ সুদীর্ঘ ও বাদামী , কিছুটা পিঙ্গল বর্ণের। রুক্ষ অবিন্যস্ত। পরনে রক্তাম্বর, পীতাম্বর শ্বেতাম্বর, গৈরিক বর্ণ ইত্যাদি বর্ণের সুতী বস্ত্র। অলঙ্কার বলতে ,স্বর্ণ কুন্ডল, স্বর্ণ বলয়, স্বর্ণ অলঙ্কার। গলায় পশুদন্তের মাল্য, মুক্তা ও পলার মালিকা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো অশোক বনে। সেখানে অশোক তরু তলে আমায়,অসংখ্য রাক্ষসী দ্বারা নজরবন্দী করে রেখেছিলো ওরা। রাক্ষসীরাও সব বিকট দর্শনা।

সুদীর্ঘাঙ্গী, পৃথুলা শরীরা, বাদামী বর্ণা বা কৃষ্ণ বর্ণা, পরনে একটিই সুতী বস্ত্র ঘুরিয়ে পড়া, রূক্ষ বাদামী কেশ, মোটা মোটা খন্ডের পশু অস্থির, নয়তো, মুক্তোর ও পলার মালার অলঙ্কার। ওরা, সব সময় মাথায়, যুথিকা পুষ্পের মাল্য দিয়ে সাজে। এছাড়াও, ওদের ওখানে জবা,পদ্ম পুষ্প দিয়ে মাতৃকা পূজার চল আছে আর বিল্বপত্র - নারিকেল- আকন্দ মাল্য যোগে মহাদেবকে অর্চনার প্রচলন আছে। ওখানে রাক্ষসীদের দেখে আমি ভয় পেতাম, আমায় খেয়ে নেবে। কিন্তু, ওরা মানুষ মারে লুঠ-পাট করবে বলে। খাওয়ার জন্য নয়। কখনো, মাতৃকা পূজায় নরবলি দেওয়ার জন্য ওদের মানুষ শিকারের প্রয়োজন হতো। তারপর, সেই মানুষের মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়ার চল ছিল বলে শুনেছি। তখন, মানুষের খুলি, হাড় সঞ্চয় করে ওরা অলঙ্কার হিসেবে ধারন করতো। সেটা ওদের বীরত্বের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু, আমার ভয় দেখে ওরা মজা পেলেও, কখনো আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। কারন, লঙ্কেশ স্বয়ং নিষেধ জারি করেছিলেন। এছাড়াও, রানী মন্দোদরী ও সখী সরমা আমার খোঁজ নিয়ে যেতেন প্রতিদিন। বিভীষন পত্নী সখী সরমার কাছে ইশারা -ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়েই ওদের ভাষা-কথা বুঝতে শিখেছি। ওদের স্ত্রী –পুরুষ নির্বিশেষে, শিকার, চাষ-বাস করে, মৎস্য ধরে ও দাস-দাসী হয়ে জীবন কাটায়। শিক্ষাগ্রহণের চল নেই ওদের মধ্যে। তাই, ওদের আচরন- চলন-বলনে, বন্য পশুবৎ লক্ষণ ফুটে ওঠে। ওরা অকারনেই বা সামান্যতম কারনেই ক্রোধে ফেটে পড়ে, মারামারি করে, যুদ্ধ করে, হানাহানি করে, আবার, প্রেমেও পড়ে তাড়াতাড়িই অগ্রপশ্চাৎ না

ভেবেই। বিবাহ করে, বা করে না-সন্তানের জন্ম দেয়, ভালোবাসে, আদর করে হৃদয় থেকে নিখাদ ভালোবাসায়। ওরা মৎস্য শিকার ও পশু শিকার করে, মৎস্য ও মাংসের অম্লরস দিয়ে সিদ্ধ ভাত খেতে ভালোবাসে। কিন্তু,আমায় কখনো ওসব অখাদ্য দেয় নি। সখী সরমা, নিজ হাতে আমার জন্য খাদ্য আনতো। সিদ্ধ তন্ডুল ও দধিযোগে অদ্ভুত স্বাদের সিদ্ধ ভাত, সম্বর ডাল, টক ভেন্ডির সব্জি, "কিরিবাত" নামে এক ধরনের নারিকেল দুগ্ধ যোগে সিদ্ধ ভাত,"কাভূম", "লুনুমিরিস" পেঁয়াজ যোগে একটা রসালো সব্জি, অদ্ভুত অদ্ভুত রন্ধন কৌশলের নিরামিষরান্না সব।যেমন, সবুজ এঁচোড়ের ঝোল বানাতো যার নাম ছিল "পোলস"। "পারিপ্পু" নামে সব সব্জি ও বিভিন্ন ফল যোগে ডাল তরকারি বানাতো ওরা। ইদিয়াপ্পাম্ নামে সিদ্ধ চাল দিয়ে পিষ্টকের মতন দেখতে খাদ্য বানাতো। "কট্টু" নামের এক অদ্ভুত চাপাটি ধরনের মিষ্টি স্বাদের পিষ্টক রুটি বানাতো, নারিকেল ও বাদাম সহযোগে চাটনি, "গোটুকলাসম্বল" নামে একটা খাদ্য। তারপর, নারিকেল, দুধ, চাল যোগে সুমিষ্ট ক্ষীর বানাতো ওরা, যাকে বলতো, "ওয়াটালাপ্পন"। ওরা বিভিন্ন সব্জি ও ফল যোগে আঁচার বানাতো। এগুলো, আমি কোনরকমে তখন গলাধঃকরণ করতাম সরমার মুখ চেয়ে। তবে, সরমা সখী আমায়, সুমিষ্ট ফল এনে দিতেন প্রচুর। আম-কলা-নারিকেল-দাড়িম্ব ইত্যাদি।কখনো কখনো একটানা প্রচন্ড দাবদাহে যখন আমার ক্লান্তি আর অবসন্নতা আচ্ছন্ন করে দিতো, অবশ শরীরে তখন প্রাণ সঞ্চার করতে, সখি সরমা, এনে দিতেন সুমিষ্ট ডাবের জল। তাই,বলতে পারো বোন,

রাক্ষসদের দেশকে আমরা, ভয় ও ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিলেও, ঈশ্বর দুহাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন । নয়তো, এভাবে ফুলে,ফলে, হাসি, আনন্দ, ভালোবাসা, সুখে ভরা থাকে গোটা দেশ? আমি বন্দী হলেও, ওরা ওদের উৎসবে, পালা -পার্বনে পূজায় আমাকে ওদের প্রসাদী ফল-মিষ্ট এনে দিতো। পূজার আশীর্বাদী পুষ্প এনে দিতো। রাবণ নিজে বসতেন মহাদেব ও মাতা মহামায়ার পূজায়। তখন,সারা লঙ্কায় চলতো বিশাল উৎসব। কাল ভৈরব ও কাল ভৈরবীর মন্দিরে পূজার জমজমাট ব্যবস্থা ও আয়োজন হতো। ইন্দ্রজিৎ পত্নী দেবী প্রমীলা, নিজে এসে, আমাকে দিয়ে যেতেন মায়ের প্রসাদী পুষ্প ও প্রসাদ। বলতেন, তুমিও মায়ের কাছে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করে প্রণাম জানাও। তখন, আমার মনে হতো না, এরা কেউ আমার শত্রু, এরা কেউ আমার ধারণায় আঁকা রাক্ষসী প্রজাতি, যারা মানুষ দেখলে, হাঁ করে গিলতে ছুটে আসে।" দেবী উর্মিলা হাঁ করে নিষ্পলকে শুনছিলো দিদির রাক্ষস দেশের বর্ণনা।

সে বললো -"আমি নিজে, এতোদিন যা ভেবেছিলাম, ওদের দেশ সম্পর্কে, তার সাথে কিছুই তো মিললো না দিদি। বরং, নতুন দেশের নতুন জীবন ও নতুন মানুষের কথা শুনলাম বলে মনে হলো। "

-" হ্যাঁ বোন। ওরা রাক্ষস ওদের সৌন্দর্যের রূপে। ওরা রাক্ষস ওদের শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবে। ওরা নিজেদের আবেগের সংযম জানেনা, বুদ্ধি প্রয়োগের সুকৌশল জানেনা। তাই, ওরা রাক্ষস ওদের স্বভাবে ও কুসংস্কারের বেড়াজালে। ওদের সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করার

বোধহয় প্রয়োজন হয়েছিল আর আমি হয়েছিলাম সেই প্রয়োজনের মাধ্যম। ভগবান, প্রভু শ্রীরাম, আমাকে উদ্ধারের মাধ্যমে , ওদের রাক্ষস জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে, সভ্য মানবজীবনের আলোকে নিয়ে এলেন- তাই, মনে হয়, এইসব সংঘটিত হলো, ঈশ্বরের এক অমোঘ নির্দেশে , লঙ্কার উন্নয়ন ও লঙ্কাবাসীর অসভ্য জীবন থেকে উদ্ধার চেয়েছিলেন মহাদেব ও মহামায়া।তাই আমাদের লঙ্কায় যাওয়া ওনাদেরই ইচ্ছায়। "

বলে দেবী সীতা শূন্যে প্রণামকরলেন। তারপর, বললেন, "বোন উর্মিলা, তুমি তো শুধু লঙ্কার কথা শুনলে। আমার তো এসময়ের অযোধ্যা নগরীর কথা, তোমার কথা কিছু জানা হলো না। শোনাও বোন। আমাকে তোমাদের কথা, অযোধ্যা নগরীর কথা সবার কথা শোনাও।"

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে উর্মিলা সীতার কথা শুনছিলো। এবার, সে সীতার কাছে, জানালো -নিজের কথা, নিজেদের কথা --" জ্ঞান বিনা, হুঁশ বিনা শরীর যেমন কাঠপুতলি হয়ে বাঁচে, তেমনই রাম- লক্ষমনকে ছাড়া বেঁচে ছিল অযোধ্যা নগরী ও এখানকার সবাই। পিতা দশরথ তো দাদার নাম স্মরণ করতে করতে, দাদা ও তোমাদের বিনা অযোধ্যা পুরীকে মেনে নিতে না পেরে, শরীর ছেড়ে চলেই গেলেন চিরতরে অমৃত লোকে। মাতা কৌশল্যার অবস্থা আরো করুণ হয়ে উঠলো। আদরের পুত্র বিনা, স্বামী বিনা এ অযোধ্যা নগরীতে তিনি একাকী অনুভব করে ক্রমশঃ অবসাদের অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন। মাতা সুমিত্রা ও মাতা কৈকেয়ী তাঁকে সুস্থতা ও আনন্দ দিতে অপারগ হলেন। আমি, অচেনা অজানা পরিবার ও জায়গায়

এসেছিলাম যার ভরসায়, সেই তিনিও আমাকে একা রেখে চলে গেলেন। আমিও যেতে চেয়েছিলাম তোমাদের সাথে। কিন্তু, উনি আমাকে মাতাদের দেখাশোনার জন্য রেখে গেলেন। এমনকি, দিদি তুমি, যার সাহচর্যে থাকবো, এই ভরসায় অচেনা অযোধ্যা নগরীতে এসেছিলাম, সেই তুমিও চলে গেলে আমায় ফেলে। বিবাহিত জীবনের সুখ কাকে বলে, জানার পূর্বেই আমার বিবাহিত জীবনে ছেদ নেমে এলো। চলে এলো দায়িত্বের ভার। সেই সাথে ছোট্ট পুত্র অঙ্গদের প্রতি মাতৃ-পিতৃ উভয় দায়িত্ব ও কর্তব্য, এবং সেই সাথে উভয়ের স্নেহ, আমাকেই দিতে হল। কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করলাম, আমার শরীরে আরো একটি প্রাণ খেলা করছে। তাকেও বড় করে তোলার দায়িত্ব আমার। ভুলে গেলাম , আমার সব শখ, আনন্দ, স্বপ্ন। ভুলে গেলাম আমার কৈশোর–যৌবনের সন্ধিক্ষণের দামালপনা, হাসি, আহ্লাদ, আবদার। আমি হয়ে উঠলাম সংগ্রামী তপস্বিনী। এই পরিবর্তনের জন্য, আমাকে নিজের সাথে নিজেকে অহরহ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। আমি বেশি করে ঘুমাতাম, আমার শরীর ও মন ঠিক রাখার জন্য, যাতে এই অপেক্ষার চোদ্দটা বছর তাড়াতাড়ি কেটে যায়। আমি তুলসী তলায়, দিবা রাত্র প্রদীপ জ্বেলে রাখতাম যাতে, আমার স্বামী যে উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে বনবাসে গেছেন,সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি যেন সফল হন। দিবারাত্রি নিজে তিনি বিনিদ্র থেকে যেন তোমাদের দুজনের একনিষ্ঠ সেবা করে যেতে পারেন। পুত্র ধর্মকেতু জন্মাবার পর, মাতারা একটু শান্ত হলেন। পুত্র অঙ্গদের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরাই নিয়ে নিলেন। নিজ পুত্র রামকে প্রতিপালনের আনন্দ আবার

তাঁরা উপভোগ করে, আনন্দে মেতে উঠলেন। আমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। পুত্র ধর্মকেতুর দায়িত্বে মন দিতে পারলাম। তবু, সকল কাজের মাঝে হারিয়ে যেতাম প্রিয় সুখের সেই মুহূর্তের স্মৃতিতে, বারবার। ভীষন ইচ্ছা হতো, একবার তোমাদের সকলকে দেখবার। ভয় হতো, আবার সবাইকে সুস্থ রূপে দেখতে পাবো তো? তারপর,তোমার লঙ্কায় অপহৃতা হয়ে যাওয়ার সংবাদে আবার সব এলোমেলো হয়ে গেলো। ভয় ও দুশ্চিন্তায় কাটতে লাগলো প্রতিটা ক্ষন। বানর রাজ সুগ্রীবের দূত এসে, শোনাতেন তোমাদের সংবাদ। প্রতিটা ক্ষণ তখন থেকে কেটেছে চরম দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায়। যতদিন না,তোমাদের লঙ্কাবিজয় ও অযোধ্যা ফেরার সংবাদ এসেছে, এই রাজপ্রাসাদের সব আনন্দ হারিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া -দাওয়া ভুলে, আমরা সবাই,নারায়নের পদতলে তোমাদের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকতাম ও প্রার্থণা করতাম। তখন, রাজা ভ্রাতা ভরত ও রাজমাতা কৈকেয়ী সামলেছেন এই দেশ, দেশের শাসনব্যবস্থাএবং এই রাজপুরীর সকলের খেয়াল। এভাবেই কেটে গেছে অযোধ্যা ও আমার চোদ্দ বছরের জীবন।"

বলে, উর্মিলা চুপ করলো। চোখ দিয়ে নেমে এলো অশ্রু ধারা। সীতারও, উর্মিলার কথা শুনে দুনয়নে প্লাবন এলো। কখন, সেই ছোট্ট বোন উর্মিলা এতো পরিণত হয়ে গেছে, তা তার দেখাই হলো না স্বচক্ষে। উর্মিলাকে,আবার সে জড়িয়ে ধরলো সস্নেহে।

বললো,-" জীবন আমাদের সবাইকে শেখালো, যতবড় সংগ্রামই আসুক না কেন, সে যে রূপেই আসুক না কেন,

বিজয়ী হতে গেলে প্রয়োজন ঐক্য বদ্ধ লড়াই, পারস্পরিক বোঝাপড়া, ও ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস, যা আমাদের মনবল বাড়িয়ে দেয় লড়াইতে। বোন, দেখো আমরা প্রত্যেকে লড়েছি। আপন আপন ক্ষেত্রে। সবাই জিতেছি, বিশ্বাস নামক অস্ত্রদ্বারা, ভালোবাসার প্রলেপ দ্বারা ও ঈশ্বরে ভরসা দ্বারা ঐক্য বোধের উপলব্ধিতে চেপে। তাই নয়?"

-"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো দিদি।"

দাসী এসে কক্ষে বাতি জ্বেলেগেলো।

দুই বোনের হুঁশ ফিরল, ততক্ষণে বাহিরে সন্ধ্যা নেমে গেছে।

উর্মিলা বললো-" চলো দিদি, মাতা কৌশল্যার সন্ধ্যা আরতির সময় হয়ে গেছে। পূজামন্দিরে সবাই কে এই সময় উপস্থিত হতে হবে। ওই শোন, কাঁসর ঘন্টার ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে চারিদিক।

-"চলো বোন।"

আবছায়া অতীত

__________শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা। সেই নিশীথ রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে, ঘটে গেলো এক অজানা ঘটনা। নদীর তীরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুই ছায়ামূর্তি। স্থূলকায় ও দীর্ঘকায় দুই ছায়ামূর্তি কথোপকথনে রত। সেই কথোপকথনের সাক্ষী হতে ইচ্ছুক থাকলে আসুন আমার সাথে।

দীর্ঘকায় _______-" দেখতে দেখতে কেটে গেলো কত বছর। সেই ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, আমি এই প্রয়াগ মেলার আয়োজন করেছিলাম। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী - এলাহাবাদের, এই ত্রিনদীর ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে, আমার প্রবর্তিত সেই মেলা, আজও চলছে রমরমিয়ে। আরো জনবহুল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই মেলা। আনন্দে আমি আত্মহারা।"

স্থূলকায়______ -" হ্যাঁ মহারাজ। আসলে, যে কোনো সৎ উদ্দেশ্য সাধনে করা মঙ্গল কর্মই, যুগোত্তীর্ন প্রসিদ্ধি লাভ করতে বাধ্য। "

দীর্ঘকায়______-" আমার কাছে, এই তিন নদী, তিন ধর্মের প্রতীক। শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব - এই তিন ধর্মের বিভেদ দূর করতে, এই তিন ধর্মকে মেলাতে আমি আয়োজন করেছিলাম এই মেলা, এই ত্রিনদীর

সঙ্গমস্থলে। ধর্ম মিলনের আনন্দই, এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল।"

স্থূলকায় ______"অথচ মহারাজ, আমি শুনেছিলাম, আপনি, রাজসিংহাসনে বসতেই অনিচ্ছুক ছিলেন। ভেবে দেখুন মহারাজ, আপনি যদি, সিংহাসনে আসীন না হতেন, তাহলে কি এতোবড় আয়োজন করতে পারতেন? "

দীর্ঘকায় ________" ঠিকই বলেছো বাণ। তবে জেষ্ঠ্য ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে, হারানোর যন্ত্রণায় আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ছিলাম।"

স্থূলকায় _______" সবই, শুনেছি মহারাজ। বোন রাজ্যশ্রীকেও আপনি, ভীষন ভালোবাসতেন। তবে, দাদার স্মৃতিতে আকুল হয়ে, দাদার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছিলেন এইমেলা।"

দীর্ঘকায় _______" দাদা ছিলেন আমার পিতৃতুল্য, আমার অনুপ্রেরণা, আমার গুরু, আবার, সেই সাথে আমার সহচর বন্ধু। তাই দাদাকে হারিয়ে আমি নিদারুণ শূন্যতায় ভরে গিয়েছিলাম, দিশাহীন অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলাম।"

স্থূলকায় -_______" শুনেছি সবই।"

দীর্ঘকায় ______" আমার দাদা ছিলেন সৌগত। তথাগত এর মতন ছিলেন উদার ও ক্ষমাশীল। কিন্তু, আমি ছিলাম মহাদেবের একান্ত ভক্ত। মনেপ্রাণে শৈব। তবু দাদাকে ভালোবাসতাম বলেই, শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব এই তিন ধর্মের প্রতি ছিল আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাই এই তিন

ধর্মের মিলনের উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন। রাজকার্যের, উদ্‌বৃত্ত ধন দান করতাম, এই মেলার আয়োজনে।"

স্থূলকায় ______" জানি মহারাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন, আপনি সত্যিই ধার্মিক রাজা ছিলেন।"

দীর্ঘকায় ______" তুমিও তো কম প্রসিদ্ধ নও বাণ। আমি আমার রাজসভায়, তোমাকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। তোমার মতন, জ্ঞানী, সুদক্ষ নাট্যকার, কবি ও সাহিত্যিককে পেয়ে, শুধু আমি নয়, সমগ্র দেশ ধন্য হয়েছিলো। "

স্থূলকায় _____" মহারাজ, আমি ছিলাম, সম্পদশালী, ধনবান, ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র। কিন্তু,ধনের প্রতি মোহ আমার কোনদিনও ছিল না। আমার আগ্রহ ছিল মানব মনের হিসাবে, মনের নানান রূপ ও ভাব-কৌশলের লীলাখেলায়। তাই,সমাজ ও মানুষের বিচিত্র রূপবৈচিত্র্য দেখতে, সবকিছু ছেড়ে বের হয়েছিলাম পথে। পিছনে পড়ে ছিল পিতার অগাধ সম্পত্তি, ফিরে তাকাইনি। সমাজ ও মানুষকে বুঝতে, জানতে, মানব মনের বৈচিত্র্যময় রূপের মাঝে, আমি, এতো আনন্দ পেয়েছিলাম যে ,অনাহার-অর্ধাহারের কষ্ট আমাকে ফেরাতে পারেনি। এভাবেই এসে পড়েছিলাম আপনাদের কাছে আমার সমস্ত সৃষ্টি আনন্দের সম্ভার নিয়ে।"

দীর্ঘকায় _____" কিন্তু, তোমার ওপর সেদিন আমি রুষ্ট হয়েছিলাম। কেন জানো ?"

স্থূলকায় ______" জানি মহারাজ। আমি, আপনার বিনা অনুমতিতে, বিনা সম্মতিতেই- আপনার রচিত -- এই নামে, আমার লেখা গুলো প্রচার করেছিলাম। কিছু লেখায় অসত্য বর্ণনাও করেছিলাম।"

দীর্ঘকায় ______" কিন্তু,কেন করেছিলে বাণ? কেন আমার নামে মিথ্যা রটালে ? প্রজার মনে আমার সম্পর্কে কেন ভ্রান্ত ধারনার জন্ম দিলে ? কেন আমার মিথ্যা চিত্ররূপ অঙ্কন করলে ? "হর্ষচরিত" রচনায়, আমার রাজৈশ্বর্যের মিথ্যা চিত্র রূপ তুলে ধরেছো। আমাকে বিলাসী রাজা রূপে আমার মিথ্যা রূপ এঁকেছো। কেন ? তাই, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, আমি সেদিন তোমাকে, রাজদরবারে ডেকে সবার সামনে অপমান ও ভর্ৎসনা করেছিলাম। মনে আছে ? "

স্থূলকায় _______" আজো মনে আছে মহারাজ, আপনি সেদিন আমায় সবার সামনে "ভূজঙ্গ লম্পট " বলে অপমান করলেন। অপমানে, আমার দুই কর্ণ রক্তাভ হয়ে গিয়েছিল। কোন কথা মুখ থেকে বার হতে পারে নি। আমি কিছুদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলাম। যে বাণভট্ট, স্বদেশে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে পূজিত হতো, তার ভাগ্যে জুটলো এই কালো অপমানের দাগ!"

দীর্ঘকায় ______" কেন, কেন করেছিলে এরকম?" স্থূলকায় _____" সেদিন অপমানে কোন উত্তর দিতে পারিনি। তবে, আজ শুনুন কেন করেছিলাম।"

দীর্ঘকায় ______" হ্যাঁ,বলো। আমি জানতে আগ্রহী।" স্থূলকায় _______" তবে শুনুন মহারাজ -আমি যখন,

পিতার আশ্রয় ছেড়ে পথে বাহির হলাম, মগধের বাহিরে এলাম,তখন,নট-নটী সংগ্রহ করে,নাট্যশালা গঠন করে নাটক উপস্থাপন করতাম। আপন কর্ম ও প্রতিভা দ্বারা, নিজের সাহিত্য প্রেমকে উপভোগ করতাম। তারুন্যের আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার মিশ্রণ ঘটিয়ে, একের পর এক নাটক উপস্থাপন করছিলাম ও প্রশংসিত হচ্ছিলাম, প্রসিদ্ধি পাচ্ছিলাম। তখন, আমি আপনাকে নামেই চিনতাম মাত্র, চাক্ষুষ দেখিনি। তবু, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, সন্মান ও ভালোবাসা অগাধ ছিল। আমি তখন কামরূপ থেকে সিন্ধু, হিমালয় থেকে সিংহল, মোটামুটি, সব রাজ দরবারেই আমার নাটক উপস্থাপন করে প্রখ্যাত হয়ে গেছি, আর, আমার প্রসিদ্ধির জন্য,সকল প্রজা তখন আমার পশ্চাদ্ধাবন করে চলতে শুরু করেছে। আমি দেখলাম, এতে আমার পথে পথে ঘুরে, নাট্যরচনার রসদ ও নট নটী জোগাড়ে অসুবিধা হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে আমি আর অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারছিলাম না। সবাই ঘিরে ধরছিলো। সব রাজারাই, তাদের রাজদরবারে, আমায়, জোর করে আটকে রেখে, রাজকবি করার ফন্দিতে, বন্দী করে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এতে, আমার সাহিত্য সৃষ্টি ও নাট্য উপস্থাপনে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই, আমি এই খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে, আমার লেখাগুলো আপনার নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। রাজন, আমি সাহিত্যপ্রেমী, ধনলোভী বা যশোলোভী নই।

দীর্ঘকায় -"বুঝলাম। তবে, তুমি যে, আমার আহ্বানে, আমার রাজসভায় নিজেকে বন্দী করলে, আমার রাজ কবির সন্মান স্বীকার করলে, সেটা কেন?"

স্থূলকায় - "মহারাজ, আপনার রাজ্য যদি আমার জন্মভূমি না হতো, তাহলে, কখনোই আমি আপনার সভায় নিজের বন্দীত্ব স্বীকার করতাম না। আমার পিতার ঐশ্বর্যই যথেষ্ট ছিলো আমার জীবনে। তাছাড়া, আপনার প্রতি আমার প্রথম থেকেই যে শ্রদ্ধা, সন্মান ও ভালোবাসা ছিল তাকে অস্বীকার করতে পারিনি। তাই, আমার লেখা গুলো আপনার নামেই উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

দীর্ঘকায় - "যথার্থই তুমি ধনলোভী, যশোলোভী ছিলে না- এ কথা সত্য। কিন্তু, "হর্ষচরিত" এ, তুমি আমার মিথ্যা বর্ণনা করেছিলে কেন ?"কাদম্বরী" তে তুমি আমার রাজদরবার ও ভোগ বিলাসের মিথ্যা বর্ণনা করেছিলে কেন ? মহাশ্বেতাতে অবশ্য সত্য লিখেছো যে, আমি, আমার রানীদের মধ্যে, পারস্য কন্যা -" নৌশেরওয়ারের নাতনি", যাকে তুমি কাদম্বরী নামে বর্ণনা করেছো, তার প্রতি বেশী দুর্বল ছিলাম। সেই সাথে সৌরাষ্ট্রীয় রানী মহাশ্বেতার প্রতিও অনুরক্ত ছিলাম। তিনিও ছিলেন পারসিক রাজবংশোদ্‌ভূতা। শুধু তাই নয়, বাণ, তুমি নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা নাটকেও, আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা তুলে ধরেছো। তোমার সব রচনা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম বাণ। আমার পরিচয়টা পর্যন্ত ভুল দিয়েছিলে। আমি, বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেনে নই। আমরা শক ক্ষত্রিয়। শক ক্ষত্রিয়দের সাথেই আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরী হতো কেবলমাত্র। তোমার যাবতীয় ভুল তথ্যে, লোকে আমার সম্পর্কে কি ভাবলো বলোতো? কত ভ্রান্ত ধারণা করলো !"

স্থূলকায় - "আপনি লোকের কথা – লোকের ভাবনা নিয়ে, এতো ভাবছেন কেন বলুন তো, মহারাজ ? লোকের কথায় কি আসে যায়! লোকে তো আমাকে নিয়েও অনেক মিথ্যা ধারণা করে রেখেছিলো। আমি নাকি, গণিকাদের সঙ্গে নিয়ে চলতাম, ওদের সাথে ওঠা-বসা করতাম এইসব। আসলে, আমি ওদের দিয়ে, আমার নাটকের নট নটী কুশীলব বানাতাম। তাই, তাদের সঙ্গে নিয়েই আমায় চলতে হতো নাট্যপ্রদর্শনের স্বার্থে।"

দীর্ঘকায় - "গণিকারা তো সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য। তুমি যদি প্রকাশ্যে ওদের সাথে মেলামেশা করো, তো, সমাজ তোমাকে কটু নিন্দা করবেই। গণিকাদের নিয়ে মিথ্যা রটনা দেবেই। "

স্থূলকায় - "আমি মনে করি না, যে তারা ঘৃণ্যা। কারন, আমি, ওদের সাথে সর্ব সমক্ষে মেলামেশা করি। কোন লুকানো সম্পর্ক রাখি না। লুকিয়ে যারা সম্পর্ক রাখে, তারা গোপন দুরভিসন্ধি নিয়ে মেশে। নিন্দনীয় সম্পর্ক তৈরী করতে যারা ইচ্ছুক,তারা, রাতের অলক্ষ্যে সবার আড়ালে লুকিয়ে যায় গণিকাদের কাছে। আমি যাই দিনের বেলায়, সবার সামনে। কারন, পরিষ্কার আমার মন, পরিষ্কার আমার উদ্দেশ্য। আমি ওদের দিয়ে আমার নাটককে উপস্থাপিত করি। ওরা আমার নাটকে অভিনয় করে নিজেদের জীবনের সৎ মূল্যকে আনন্দের সাথে অনুভব করতে পারে। নিজেদের জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এর জন্য ওরা আমায় শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, স্নেহ করে,মন থেকে আশীর্বাদ করে, মঙ্গল কামনা করে আমার জন্য।"

দীর্ঘকায় - "তথাগতও শুনেছি, গণিকাদের মানুষের মর্যাদাই দিতেন। আম্রপালি তার জ্বলন্ত উদাহরণ।"

স্থূলকায় - " কেন মর্যাদা দেবেন না মহারাজ? এদের এই জীবন এরা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি। রাজা-মহারাজা-আমীর-ওমরাহরা, নিজেদের এক রাত্রের আনন্দ উপভোগের জন্য এদের ব্যবহার করে, তারপর, সারা জীবনের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দেন আস্তাকুঁড়েতে। আর, দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না। এদের সমস্ত জীবনটাই কেটে যায় ব্যর্থতায়। কারন, এদেরকে সমাজ আর সামাজিক জীবনে গ্রহণ করে না। চরম ঘৃণার সাথে সরিয়ে দেয়, চিরতরে। এরা, মৃতবৎ জীবনে বেঁচে থাকে। অথচ, এইরূপ পরিণতির জন্য এদের কোন দোষ নেই। ওরা সমাজের সম্ভ্রান্ত নরপশুদের লালসার অসহায় শিকার। আর ওরা যে সমাজের মাথা রূপ মানুষের যৌনতার শিকার হয়, তা ওদের চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য। কিন্তু, আমি দেখেছি, এদের মধ্যে অনেক গুণ আছে। কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে, কেউ বা অভিনয়ে খুবই পারদর্শী হতো, যাদের এইসব গুণগুলো, বিনষ্ট হয়ে যেতো সমাজের অবহেলায়। তাই, আমি এদের প্রকাশ্যে, নিজেদের স্বপ্ন পূরণের, গুণ গুলোর স্বীকৃতি লাভের সহায়তা করে এদের বাঁচার পথ দেখিয়েছিলাম। সিন্ধু থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে সিংহলের অনুরাধাপুর পর্যন্ত সর্বত্র ধ্বনিত হয়েছে এই গণিকাদের অভিনয় পারদর্শিতার প্রশংসা। এরা প্রত্যেকেই যাতে, নিজ নিজ গুণে আদরণীয় হয়ে উঠে আমার সাহায্য ছাড়াই, পরবর্তী কালে,নিজেদের জীবনটাকে ভালো ভাবে কাটাতে পারে সন্মানের সাথে- এটাই ছিল আমার

উদ্দেশ্য। পরিবর্তে, যে অপমানই জুটুক না কেন, কিছু নারীকে তো আমি বাঁচার পথে হাত ধরে পৌঁছে দিলাম। জীবনের তৃপ্তি লাভের আস্বাদ দিলাম। আমার মানবজীবন এভাবেই সার্থক হয়েছিল মহারাজ।"

দীর্ঘকায় - "আমি, তোমার এ মহানুভবতাকে এভাবে দেখে উপলব্ধি করতে পারিনি বাণ। আমিও তোমায় ভুল ভেবে লম্পট বলে অপমান করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো বাণ।"

স্থূলকায় - "কি ব্রাহ্মনকন্যা, কি বেনের কন্যা, গণিকা মাত্রই ছিল সামন্ত প্রভুদের নিজস্ব সম্পত্তি। আমার কাছে পর সম্পত্তি। আমি কি পর-সম্পত্তিতে চক্ষুদান করতে পারি মহারাজ? সে তো চৌর্য-কার্যের সামিল। "

দীর্ঘকায় -"লোকে তো তোমাকে দুর্মুখ অপবাদও দিয়েছিলো বাণ ! কেন ?"

স্থূলকায় - "আমি বরাবর সত্য কথা বলি মহারাজ, তা সে যতই অপ্রিয় হোক। এই অপ্রিয় বলার জন্য আমি দুর্মুখ। যেমন, আপনি বলছেন, আমি আপনার নামে মিথ্যা বর্ণনা করেছি। আমি যদি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিই, কোন মিথ্যা আমি বলি নি, তাহলে, আমার যুক্তি ও কথাগুলো আপনার অপ্রিয় লাগবে। আপনিও, আমাকে দুর্মুখ বলবেন মহারাজ।"

দীর্ঘকায় - "তুমি যদি যথার্থ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও আমায়, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে দুর্মুখতো বলবোই না, উল্টে, সেদিনের কথাগুলো তুলে নিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো।"

স্থূলকায় - "তাহলে শুনুন, মহারাজ, আপনি বলছেন, আপনি, লোভী, ভোগী ছিলেন না। তাহলে, কেন আপনি আমাকে একবারও বলেন নি, বাণ, তোমার লেখাগুলো, এবার, তোমার নামে প্রচার করো। আমি তো তখন আপনার রাজসভাকবি ছিলাম। কেন এরকম করেছিলাম আমি, আপনার নামে আমার লেখাগুলো প্রচার, আপনি তা একবারো, আমায় সস্নেহে, জিজ্ঞাসা করেন নি, উল্টে, সর্ব সমক্ষে আমাকে গালি দিলেন। আপনি উপভোগ করছিলেন লেখনী স্তুতির বাহবা। আর, সেই রূপটাই ঢাকতে, আমায় রাগ দেখিয়েছিলেন। তা না হলে আপনি আদেশ দিতেন, এবার থেকে তুমি -'শ্রীহর্ষ নিপুণাঃ কবি'র পরিবর্তে, প্রকাশিত করো -'শ্রী বাণ নিপুণাঃকবি'। কিন্তু, আপনি সে আদেশ কখনো দেননি। কারন, প্রচ্ছন্নে লুকিয়ে থাকা আপনার যশোলোভ - যাকে আপনি দেখতে পাননি, বা দেখতে চাননি।"

দীর্ঘকায় - "হ্যাঁ, একথা তো আমার মাথায় আসেনি। এভাবে আদেশ দিলেই তো মিটে যেতো। তা নয়, মিথ্যা মুখ খারাপ করেছিলাম আমি। ছিঃছিঃ। আচ্ছা, এবার বলো, আমার রাজ্যের মিথ্যা বৈভবের বর্ণনা কেন করেছিলে তোমার লেখায়?"

স্থূলকায় - "মহারাজ, আমি যদি তা না করে, তার পরিবর্তে, দেশের পর্ণ কুটিরগুলোর এবং দুঃখ দুর্দশা পূর্ণ প্রজা জীবনের বর্ণনা করতাম, তাহলে, তা, দেশের রাজা ও সামন্তদের ওপর গভীর কালিমা লেপন হতো না? একদিকে, প্রজারা দারিদ্র্যের ঘোরসঙ্কটে ও অর্থকষ্টে ভুগছে , আর, অন্যদিকে, প্রতি পঞ্চম বর্ষে,

প্রয়াগ মেলার নামে,দেশের রাজকোষ উজাড় করা উৎকোচ যাচ্ছে ব্রাহ্মণ- শ্রমণদের অর্থদানে- এ রাজা হিসেবে আপনার কোন রূপকে তুলে ধরতো?

দীর্ঘকায় - " এতো ভেবে, মানুষের মনের এতো হিসাব কষে, আমি চলতে পারি না। তবে তাতে কি, আমার প্রতি, কোন বিদ্বেষ, আদৌ কোন প্রজার মনে ছিল? আর, বলতে পারো, এই জন্যই তো আমি, প্রথমে রাজসিংহাসনে বসতে চাই নি। রাজৈশ্বর্য ও রাজসিংহাসনে আমি বরাবরই উদাসীন ছিলাম।"

স্থূলকায় - -" আপনি যদি রাজসিংহাসন ও সুন্দরী নারীদের প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাহলে, দেশের প্রজাদের প্রতি মন দেননি কেন? শুধু ব্রাহ্মন আর শ্রমণদের আশীর্বাদেই কি আপনার সব কর্তব্য শেষ হয়ে যায় ? সব পূণ্যের প্রাপ্তি হয়ে যায় ? সমাজের অন্তরালে, নিরন্তর বহে চলা অশ্রুনীর আপনি বন্ধ করতে, এতোটুকুও উদ্যোগ নেননি- কেন ? যখন আপনি নিজে করেন নি, কিন্তু আমি করতে উদ্যোগী হলাম, সমাজের সতীদাহপ্রথা ও অবাধে ভ্রূণ হত্যার মতন দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম, তখন আপনি আমাকে সমর্থন না করে, ব্রাহ্মণ তোষনের জন্য, ব্রাহ্মণদের হয়ে তাদের সাথে গলা মিলিয়েছিলেন। -কেন? অন্যায়ভাবে অন্যায়কে সমর্থন করে, ব্রাহ্মণ তোষন করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করাকে কোন ধর্ম বলে মহারাজ?- মানবধর্ম না ভোগবাদী ধর্ম? তাহলে আপনি ভোগবাদী নন ? আমি মিথ্যে বলেছিলাম মহারাজ ?

দীর্ঘকায় - -"ওই যে বলেছিলাম, আসলে, তুমি যা দেখতে পেতে, বুঝতে পারতে তা সাধারণ লোকে পারতো না। আমিও তেমন পারিনি বাণ।"

স্থূলকায় -" আমার আরো একটা অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে। আপনি ক্ষমতায় এসে আপনার দেশের ক্রীতদাসদের দুঃখ দূর করতে পারতেন। ওদের মুক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু, আপনি তা করেন নি। ওদের কথাও একমুহুর্ত আপনি ভাবেন নি। অথচ, আপনি বলেন, যে আপনি তথাগতের অনুরক্ত। আমি শুনেছি, বোধিসত্ত্ব নিজে বলেছেন, -' যতক্ষণ, একটি প্রাণীও বন্দী থাকবে, ততক্ষন পর্যন্ত নির্বাণ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।' তাহলে মহারাজ, চন্ডালরা, যখন পথ ধরে চলতো, তখন, তারা একহাতে দন্ড, আরেক হাতে পিক্ দানী নিয়ে চলতো কেন? তাদের হাতে দন্ড থাকতো, যাতে তাদের দেখেই, পথচলতি সবাই বুঝে যায়, যে তারা চন্ডাল। আর, তখন সবাই, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা, ঘৃণায় সেই পথত্যাগ করতো। তাদের হাতে পিক্ দানী থাকতো, যাতে, তারা তাদের থুতু দিয়ে রাজ্যের মাটিকে কলুষিত না করতে পারে"

দীর্ঘকায়- -"এরূপ বিধান তো ব্রাহ্মণরাই দিয়েছিলেন। আমি তার পালন করেছিলাম মাত্র।"

স্থূলকায় -"একটা সারমেয়কেও যে ঘৃণা দেখানো হতো না, একটা চন্ডালকে তা দেখানো হতো। আর, আপনি, রাজক্ষমতা ও রাজশক্তির অধিকারী হয়েও, রাজ-আদেশ ও রাজাজ্ঞা প্রদান করে এ অন্যায় নিয়মের প্রতিকার করেননি, সে শুধু ব্রাহ্মন তোষনের জন্য! কারন,তা না

হলে, রাজত্ব চালাতে আপনার অসুবিধে হতো। বিদ্রোহের শিকার হতে হতো। তাহলে, রাজসিংহাসনের লোভ আপনার ছিলো না বলছেন? এরপরেও বলছেন ? রাজন, আপনি নিরঙ্কুশ সিংহাসন ভোগের জন্য, সমাজের সব অন্যায়, অনিয়ম, নিষ্ঠুরতাকে, সবরকম অমানবিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপরেও, মিথ্যা বলছেন- আপনি ভোগী ছিলেন না, লোভী ছিলেন না, আপনি চরিত্রবান ছিলেন, মিথ্যা বলতেন না! মিথ্যাচার করতেন না ! "

দীর্ঘকায়– “আমি দেশ ও সমাজের শান্তি রক্ষার স্বার্থে এরকম মুখ বুজে সব মেনে নিয়েছিলাম।"

স্থূলকায় -"আপনি পারেন নি, বিবেকের তাড়নায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, রাজ সিংহাসন ছেড়ে পথে নামতে। আপনি পারেন নি, আপনার উচিৎ কর্ম নির্ধারিত করতে। তাহলে, কোন অধিকারে আমার ওপর ক্রোধ, দোষারোপ বর্ষণ করেছিলেন মহারাজ?"

দীর্ঘকায়-“বাণ, তোমার হৃদয়ে, আমার প্রতি এতো ঘৃণা ও ক্ষোভ জমা ছিল ! আমি ধর্ম ভীরু ছিলাম বাণ।"

স্থূলকায় -"ধর্ম আমাদের জীবনে নাগপাশের মতন মহারাজ। আপনি, সেই নাগপাশে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন, অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। "

দীর্ঘকায় -"আমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলে, “হ্যাঁ” বলবে। কিন্তু, রসনাকে জিজ্ঞাসা করলে “না” বলবে। কারন, আমি রাজা। " স্থূলকায় অট্টহাসিতে ভরিয়ে দিলেন দিগন্ত। কাকের কা কা রবে ঢেকে গেলো সে

আওয়াজ। পূবের আকাশ বেগুনী রঙে রেঙে উঠতে লাগলো। একটা-দুটো সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রী স্নান সারতে এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকেই।

আঁধারের শপথ

__________ ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আকাশে আঁধার নেমে এলো। দাসী এসে রোজকার মতন দীপ রেখে দিয়ে গেলো অলিন্দের আনাচে কানাচে। বালক তিনটেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আরুষি, কেঁদেছে অনেকক্ষণ। এবার উঠে দাঁড়াবার পালা। দূর থেকে ভেসে আসছে, মন্দিরে স্তোত্র পাঠের সুর।   আরুষি উঠে দাঁড়িয়ে, একটা জ্বলন্ত দীপ হাতে, এগিয়ে চললেন, বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতার কক্ষের দিকে। এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না ওনার কথা। এতোবড় রাজপ্রাসাদে, আরুষি ছাড়া, আর কেউ নেই ওনাকে দেখার।

-" মা, আর কি হবে দুঃখ করে! যা হবার, সে তো হয়ে গেলো।"

-" আরুষি! পুত্রী আরুষি! এতোবড় গান্ধার রাজ্য, শশ্মানের মতো হয়ে গেলো। আমার শতপুত্র বন্দী হয়ে গেলো। একটি পুত্রও আর আমার কাছে থাকলো না, কোন একজনকেও আর আমি কোনদিন দেখতে পাবো না । গান্ধার নরেশও, চিরকালের মতন চলে গেলেন বন্দী জীবনে, হস্তিনাপুরের কারাগারে, আমার শত পুত্র ও শকুনির সাথে। ভীষ্ম এ কি করলো আমার!" কান্নায় ভেঙে পড়লেন গান্ধারসম্রাজ্ঞী।

-" মা, আপনি না ক্ষত্রিয়া বীরাঙ্গনা । আপনার তেজ, আপনার সাহস আমাদের সমগ্র গান্ধার রাজ্যের শক্তি। আপনি যদি ভেঙে পড়েন, আমাদের, সমগ্র গান্ধাররাজ্যের কি হবে! আপনি শক্ত হোন মা। রাজত্ব ও রাজনীতি অকারনেই ধ্বংস ডেকে আনে – এই কথা তো আমরা রাজপরিবারের সবাই জানি। শক্ত হোন মা। আমাদের এখন দেখতে হবে, আমাদের গান্ধার রাজ্য যেন আমাদের হাতেই থাকে। আমাদের তক্ষশীলা কে আমরাই রক্ষা করবো মা।"

-" কে দায়িত্ব নেবে এই সাম্রাজ্যের! কে থাকলো আর? কোন পুরুষ বসবে এখন তক্ষশীলার সিংহাসনে ?" বিষাদ ও দুশ্চিন্তায় গান্ধার সম্রাজ্ঞীর গলা কেঁপে উঠল।

-" মা, আপনার অভিজ্ঞতা তো কম নয়। এখন এ দায়িত্ব আমাদেরই নিতেহবে।"

-" পুরুষপুর, পুষ্কলাবতী এমনকি তক্ষশীলার প্রজারা, মহিলা শাসিত সাম্রাজ্য কি মেনে নেবে?"

-"আমরা তক্ষশীলার সিংহাসনে এখন আমার জেষ্ঠ্যপুত্র উলুকিকে বসিয়ে, যতদিন না ও বড় হচ্ছে, ওর নামে, ওর হয়ে আমি রাজত্ব চালিয়ে যাবো, অবশ্যই, আপনার পরামর্শে। তাই,বলছি, যতদিন না উলুকি বড় হচ্ছে, ততদিন আমাদেরই রাজত্ব চালাতে হবে। আমাদের শক্ত হতে হবে মা। নাহলে, বহির্শত্রু দখল করে নেবে আমাদের দেশ। "

-" ঠিক বলেছো মা আরুষি। আমি আর দেরি করবো না। কালই, রাজসভার আয়োজন করে, সবাই কে ডেকে

ঘোষনা করে দেবো, এ গান্ধার নরেশ সুবলের আদেশ, ও ইচ্ছা। ওনারা ফিরে এলে, ওনারাই চালাবেন এ সাম্রাজ্য। " -" আমি এখন আসি মা, আপনি বিশ্রাম নিন আর মনে মনে তৈরী হয়ে নিন। আমি আমার সন্তানদের গিয়ে দেখি। ওরা, পিতা ও পিতামহের জন্যকাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হলো, যাই ওদের ঘুম ভাঙাই।"

-" হ্যাঁ, যাও মা। ওরা তিনজনেই খুব ছোট। ওরা খুব ভয় পেয়েছে এসব দেখে। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা তো।"

-" হ্যাঁ মা, কতই বা বয়স ওদের! উলুকি একটু বড়- আট বছর। বাকি দুই জন- বৃকাসুর ছয় বছর আর, বৃপ্রাচিত্তি তো মাত্র চার বছরের। তাই খুব ভয়পেয়েছে।"

"দাসী উর্বশী, তুমি সব সময় মাতার পাশে ও সঙ্গে থেকে মাতার যত্ন ও দেখভাল করো। মাতাকে এ সময়, একা ছেড়ে চলে যেও না যেন। "

-" না মাতা আরুষি, আমি সবসময় ওনার খেয়াল রাখবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বলে দাসী, আরুষিকে প্রণাম জানালো।আরুষি , দাসীদের শ্বশ্রুমাতার সেবা যত্ন করতে ও খেয়াল রাখতে বলে প্রস্থান করলেন। আরুষি, সন্তানদের নিজের কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করলেন এখন কিছুদিনের জন্য। রাত্রে, তিনটি শিশুকে নিজের হাতে খাইয়ে, ওদের সাথে গল্প করে, ওদের মন ভালো করে দিলেন।

বললেন, -" তোমাদের পিতা, কিছুদিনের জন্য বহির্দেশে গেছেন। ফিরে আসবেন আবার।" ছেলেরা নিশ্চিন্ত হলো, পিতা ফিরে আসবেন শুনে। ছোট দুই ছেলে বুঝলেও,

উলুকি বুঝলো না। সে অপেক্ষা করতে লাগলো, দুইভাই কখন ঘুমিয়ে পড়বে।

-" মা, আমার তোমার সাথে কিছু কথা আছে।" দুই ভাই ঘুমিয়ে পড়তে, উলুকি বললো।

-" আমার ও তোমাকে কিছু বলার আছে উলুকি।" আরুষি জানালেন।

-" মা, ভীষ্ম দাদু তো ভালো,আমাকে পিসি গান্ধারীর বিবাহের সময়, কত আদর করেছেন! তবে তিনি, কেন আমাদের দেশ আক্রমণ করে, পিতামহ ও পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন ?"

-" সে অনেক কথা। সবই, তোমার পিসির ভাগ্য আর আমাদের ভাগ্যের জন্য। ওসব পরে জানবে। আপাততঃ শোন, কাল সকালে, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তোমায় তৈরী হতে হবে রাজসভায় যাওয়ার জন্য। কাল থেকে তোমাকে হতে হবে গান্ধার নরেশ, পিতামহের মতো, ততদিন, যতদিন না, তোমার পিতা শকুনি, সিংহাসনে বসার জন্য ফিরে আসছেন। তোমার নামে চলবে রাজত্ব। চালাবো আমি। পারবে তো গান্ধার নরেশ হতে?"

-" পারবো মা। তুমি তো আছো আমার পাশে। ভয় কি ? তাছাড়া, এ সিংহাসনে, একদিন না একদিন তো আমাকে বসতেই হতো।"

কেটে গেলো বেশ কিছু বছর।কাল কুঠরীতে বন্দী থেকে, রাজা সুবল দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শকুনি এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বদলার পথ খুঁজে যেতে লাগলেন।

-" পুত্র শকুনি, আমার কি পাপ হয়েছিল বলো তো! আমি তো যা করেছি, সন্তানদের লাভের জন্য করেছি। সে তো, সব পিতাই করে। তার জন্য এতোবড় শাস্তি !"

-"পিতা আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি এর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। যেভাবে, আমাদের শতভ্রাতাকে বন্দী করা হলো, গান্ধার রাজ্যকে শাসকহীন করা হলো, সেভাবেই শাসকহীন করে দেবো হস্তিনাপুর রাজ্যকে। আমার ভ্রাতাদের যেভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে সেভাবেই কৌরবদের শতভ্রাতাকেও আমি ধ্বংসের পথে ঠেলে দেব। এ শকুনির বচন, পিতা আপনাকে।"

-" গান্ধার রাজ্যের কোন খবর জানতে পেরেছো পুত্র ?"

-"হ্যাঁ পিতা, শুনেছি, আপনার পৌত্র উলুকি, এখন গান্ধার সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে,আর, তাকে, এ কার্যে সাহায্য করছেন, আপনার পুত্রবধূ আরুষি আর রাজমাতা । শুনেছি তো ভালোই রাজত্ব চালাচ্ছে ।"

-"আঃ, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার দাদুভাই এতোবড় হয়ে গেছে যে গান্ধার নরেশ হয়ে গেছে ! একবার যদি এই দৃশ্য, নিজের চোখে দেখতে পেতাম !"

-" সংবাদটা শুনে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি, আনন্দিত তো বটেই। গর্বে, বুক ভরে উঠছে।"

গান্ধার রাজ্যে, নগরায়ন ক্রমশঃ উন্নতি করে চলেছে। সদ্য কৈশোরে পা রেখেছে উলুকি। রাজপ্রাসাদের বাইরে চলছে, পক্ষী শিকারের খেলা। কুমার উলুকি, একটি ময়ূর ও একটি কবুতর শিকার করেছেন। সেই আনন্দে উল্লসিত বাকি দুই ভাই - বৃকাসুরা ও বৃপ্রাচিত্তি। ময়ূর ও

কবুতর দুটোকে ঘিরে চলছে নানান জল্পনা, ভাইতে ভাইতে। এমনসময়, আরুষির আগমন। -" মা, দ্যাখো দ্যাখো, আমাদের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা, পক্ষী শিকার করেছেন।"

-" ভ্রাতা,তোমরা আমাকে গান্ধার নরেশ বলো।"

-"গান্ধার নরেশ যথার্থ ভাবে হতে গেলে, আর এভাবে শুধু পক্ষী শিকারে দিন কাটালে চলবে না। লেখা -পড়া শিখতে হবে তো ?, অশ্ব চালানো, পশু শিকার, মল্ল যুদ্ধ, শরীরের কসরৎ, অসি চালনা, সবশিখতে হবে না? আগে শিখবে, তবেই তো পারবে, দেশকে সুরক্ষা দিতে, সাম্রাজ্য বর্ধিত করতে। কাল থেকেই ভাবছি, উলুকির এইসব শিক্ষা শুরু করে দেবো। কি উলুকি,তাই তো?"

-" আপনি যা ভালো বোঝেন মাতঃ।" উলুকি, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল।

-" মাতঃ, আমরা কবে শিখবো?"

-" সবাই শিখবে। তোমরা এখনও বয়সে একটু ছোট । আর, দুই-তিন বছর পর থেকে, তোমাদেরকেও সব শিখতে হবে। রাজপরিবারের উপযুক্ত হতে হবে তো তিন জনকেই। তোমরাই তো, গন্ধর্বের আশা- স্বপ্ন - শক্তি - ভবিষ্যৎ।পরদিন থেকে চললো, শকুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভবিষ্যতের গান্ধার নরেশ উলুকির সব রকমের প্রশিক্ষণ। একে একে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল উলুকি। আরুষির গর্ব হয়ে উঠলো সে। আরুষির স্বপ্ন ও পরিশ্রম সার্থক হল।কেটে গেলো, আরো কয়েক বছর। -" এখন আমি বড় হয়েছি মাতঃ, কয়েক দিবস পরেই

আমার বয়স ষোল বৎসর হবে।"- উলুকি, রাজসভায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে বলে উঠলো।

-" হ্যাঁ পুত্র, তোমার পিতামহীর আশীর্বাদ নিয়ে এবার তোমার অভিষেক হবে। তুমি এবার একাই, নিজের বুদ্ধিতে, সাম্রাজ্য চালাবে।" আরুষি গর্বের সাথে বলে উঠলেন।

-"প্রণাম মহারানী, পত্র নিয়ে দূত এসেছেন হস্তিনাপুর থেকে।" এক দাসীর নিবেদনে চমকে উঠলো আরুষি ও উলুকি দুজনেই। -" হস্তিনাপুর থেকে !" -" দূতকে রাজসভায় উপস্থিত হতে বলো।" উলুকির আদেশ জারি হলো।

-"কি সংবাদ দূত ?"

-" গান্ধার নরেশ, দুঃসংবাদ আছে। মহারাজ সুবল, দেহত্যাগ করেছেন।গান্ধার পুত্র শকুনি কারামুক্ত হয়ে, পিতার অস্থি কলস সহ গান্ধার রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। আর, একদিন-দুদিনের মধ্যেই গান্ধাররাজ্যে পৌঁছে যাবেন।"

-"পিতামহ দেহ রেখেছেন! পিতা আসছেন ওনার অস্থি কলস সহ!" উলুকির কন্ঠে চাপা যন্ত্রণার সুর। এতদিন পর, পিতাকে দেখার আনন্দ ফল্গুধারার মতো চাপা পড়ে গেলো পিতামহকে হারানোর বেদনায়।

-" রাজমাতার বয়স হয়েছে, তার ওপর অসুস্থ, তিনি কি পারবেন এসংবাদ সহ্য করতে ? ওনাকে কিভাবে সংবাদটা দেওয়া হবে?" আরুষির কন্ঠে শোনা গেলো দুশ্চিন্তার রেশ। পরদিন সকালে গান্ধার পুত্র শকুনির

প্রবেশ গান্ধার রাজ্যে। হাতে ধরা মহারাজ সুবলের মুখবন্ধ অস্থি কলস। রাজমাতা, শতপুত্রের কনিষ্ঠতম শকুনি কে দেখে, আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

"শান্ত হোন মাতা। আমি পিতাকে কথা দিয়েছি, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবোই। আরুষি আমার মাতাকে সামলাও। রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে যাও। আমি, সবার পূর্বে, আমার আদরের পুত্রদের দেখবো আরুষি। আমাদের অবর্তমানে, তুমি, পুত্র উলুকিকে দিয়ে, যেভাবে গান্ধাররাজ্য সামলেছো, তার জন্য আমি তোমার কাছে ও পুত্র উলুকির কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি নিশ্চিন্ত উলুকির ব্যাপারে। পুত্র উলুকি, আমার গর্ব, আমার ভরসা, আমার অবলম্বন। দেখি একবার তাকে। " শকুনি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন।

-" যাও পুত্রগণ" আরুষির এই নির্দেশে, একে একে, তিন পুত্র এসে, পিতা শকুনি কে প্রণাম করে নত মস্তকে দূরে গিয়ে দাঁড়াল । শকুনি, পরম স্নেহে, তিনজনকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন।

-" চলুন পিতা, বিশ্রাম করবেন চলুন।" উলুকি পরম শ্রদ্ধায় পিতাকে ধরে নিয়ে গেলো রাজ-অন্তপুরে। ছোট পুত্র, বৃপ্রাচিত্তি, বড় হলেও, তখনো, অপরিনত বয়সের। সে,বিস্ময় সহ প্রশ্ন রাখলো পিতাকে, -" এই কলসে কি আছে?" শকুনি হেসে উত্তর দিলেন -"তোমার পিতামহ।" বৃপ্রাচিত্তি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। সে এতো ছোট বয়সে পিতাকে দেখেছিলো যে, পিতা সম্পর্কে কোন

স্মৃতিই তার আর নেই মনের মধ্যে। তাই, সে আবার নতুন করে পিতাকে চিনতে শুরু করলো।

-" আরুষি, এই কলস, যত্ন করে রাখার ব্যবস্থা করো। আজ আমি ক্লান্ত। কাল আমি এর ব্যবস্থা করবো। কাল, আমি চাইলে, আমায় কলসটা দেবে। আর, আগামী কাল রাত্রে, আমি ভৈরো পূজা করবো। কাল অমাবস্যা। তুমি উপযুক্ত তন্ত্র সাধক সহ পূজার ব্যবস্থা করো।"

-"বেশ, তাই হবে। আপনার সকল ইচ্ছা ও আদেশ পূর্ণ হবে গান্ধারনরেশ।"

-"আজ রাত্রে, তোমার ও পুত্র উলুকির সাথে আমার কিছু কথা আছে। ডাকলে, তোমরা দুজনেই আসবে। এখন, আমি একটু বিশ্রাম নেবো। "

-" নিশ্চয়ই মহারাজ।" রাত্রে, নৈশভোজে আবার দেখা হলো, মহারাজ শকুনির সাথে, তিন পুত্রের। অনেকক্ষণ ধরে চললো,গল্প। কে কি শিক্ষা লাভ করছে, কে কিসে পারদর্শী, কার কি স্বপ্ন ও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার কি আশা এইসব। গান্ধার রাজ শকুনি,উলুকির কাছ থেকে সম্যক জেনে নিলেন প্রতি বেশী রাজ্যগুলোর, বিশেষ করে, পুরুষপুর, পুষ্কলাবতী প্রভৃতি রাজ্যের অবস্থা ও তক্ষশীলার সাথে তাদের সম্পর্ক কি রকম- এইসব রাজনৈতিক সংবাদ ও পরিস্থিতি। আলোচনা চললো অনেকক্ষন। রাজমাতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে, বহু বছর পর, নৈশভোজের খাদ্য পরিবেশন করে খাওয়ালেন। শকুনি মাতাকে, ভগিনী গান্ধারীর কথা জানালেন। নিশ্চিন্ত করলেন মাতাকে। গান্ধারীর শতপুত্রের কথাও শোনালেন। সেই সাথে শোনালেন,

কারারুদ্ধ জীবনের কষ্টের কথা। কিভাবে তিনি পিতা সুবলকে কথা দিয়েছেন, এই কারারুদ্ধ জীবনের কষ্টের প্রতিশোধ নেবেনই একদিন। কিভাবে শকুনি, চোখের সামনে পিতাকে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখলেন, ভাইদের মৃত্যু দেখলেন এসবই বিস্তারিত জানালেন তিনি। রাজমাতা চোখের জলে বস্ত্র ভিজিয়ে শুনলেন দুর্ভাগ্যের সমস্ত কথা । জেষ্ঠ্য পৌত্র উলুকি আর আরুষির চোখে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের আগুন, অন্য দুই পৌত্র স্তব্ধ নির্বাক হয়ে শুনলো সব বিবরণ।

-" পিতা, আমাকে ডেকেছেন?" উলুকির প্রবেশ শকুনির শয়নকক্ষে।

-" হ্যাঁ পুত্র, তোমার মাতা, সম্রাজ্ঞী আরুষিকেও ডেকেছি। তুমি এখন বড় হয়ে গেছো। এখন, তুমি আমার বল, ভরসা, অবলম্বন। তাই, তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই পুত্র।"

-" অবশ্যই বলুন পিতা। আমি শুনতে ও যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত। সর্বদা আপনি আমাকে পাশে পাবেন পিতা।"

-" জানি পুত্র। তাই তো, পরম নিশ্চিন্তে আমি তোমাকে বলতে চাই।"

-" আমাকে ডেকেছেন স্বামী।" কক্ষে আরুষির প্রবেশ।

-" হ্যাঁ রানী। বসো। কিছু কথা আছে।"

-"বলুন প্রভু।" আরুষি উপবেশন করলেন। গান্ধার রাজপুত্র শকুনি বলতেশুরু করলেন " যখন বন্দী হয়ে আমরা হস্তিনাপুরের রাজসভায় পৌছালাম, তখন,

হস্তিনাপুরের রাজসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। "

-" কিন্তু, কেন পিতা ? এই প্রশ্নটাই আমাকে ছোট থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কেন ? "

-" সবই ভাগ্য পুত্র! গান্ধারী, আমার সহোদরা, তোমার পিসি বুয়াকে মনে আছে তো ? অসাধারণ সুন্দরী দেখতে ছিলেন। বিবাহের বয়স এসে পৌঁছাতে, বিভিন্ন দেশের থেকে ওর জন্য বিবাহের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। পিতা-মাতা সহ তখন সবাই স্থির করলো, ওর বিবাহ দিতে হবে। ঠিক সেই সময় আমাদের গান্ধারের রাজ-জ্যোতিষী জানালেন, তোমার পিসি মাঙ্গলিক। ওনার সাথে যারই বিবাহ হবে, তারই মৃত্যু হবে। বোন গান্ধারীর এই ভাগ্য দোষ কাটাতে, জ্যোতিষী উপায় দিলেন, পূর্বে কোন ইতর প্রাণীর সাথে বিবাহ দিয়ে, তারপর মানুষের সাথে বিবাহ হলে, এই দোষের প্রকোপ মানুষ স্বামীর ওপর পড়বে না। আমরা তখন গান্ধারীর বৈধব্য জীবনের অভিশাপ কাটাতে, সেই কার্যই উচিত বলে মেনে নিলাম। গান্ধারীর সাথে প্রথমে, এক অজের বিবাহ দিয়ে, তারপর, হস্তিনাপুরের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সাথে তোমার পিসীবুয়ার বিবাহ দেওয়া হলো। সেই অজের, বিবাহের পরেই, সত্যি মৃত্যু হয়েছিল। যাই হোক,আমরা এই কার্য তো করেছিলাম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জীবনরক্ষার জন্য। কিন্তু, এই সমস্ত কথা সেই সময়, লজ্জায় হস্তিনাপুরের কারোকে জানানো হয় নি। এই অপরাধ- শুধু এই অপরাধ। পিতামহ ভীষ্ম কোথা থেকে যেন জানতে পেরেছিলেন সব ঘটনা। হস্তিনাপুরের সবাই মনে

করেছে, আমরা এই ভাবে সকল কিছু চেপে গিয়ে, একটা অজের সাথে বিবাহ হওয়া কন্যার সাথে, আবার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়েছি হস্তিনাপুরের মহারাজের! এটা মহারাজকে ও হস্তিনাপুরের রাজবংশকে - অপমান। তাই তারা প্রতিশোধ নিতে গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করে, আমাদের নিয়ে গিয়ে, হস্তিনাপুরের কারাগারে বন্দী করে দিলেন। আচ্ছা, পুত্র, ওরা আমাদের অসহায়তাকে অনুভব না করে, এভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার করলো, এটা কি উচিত কার্য হয়েছে? বোন গান্ধারীর ওপর এ কোন নিয়ম আরোপিত হয়েছে! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে, আমার বোনকেও দুই চক্ষু বন্ধন করে আজীবন অন্ধ নারীর জীবন কাটাতে হবে! এতো অত্যাচার! "

-" অবশ্যই পিতা - এ অন্যায় অত্যাচার। গান্ধার রাজ্যের সাথে ও গান্ধার কন্যা পিসির সাথে, আমার পিতামহের সাথে, আমার জেষ্ঠ্য তাতসকলের সাথে, পিতা আপনার সাথে এ এক ভয়ঙ্কর অন্যায় অবিচার । এর প্রতিশোধ নেবো আমি।"

-" পুত্র, আমি থাকতে, তুমি না। আমি আমার পিতাকে কথা দিয়েছি, এর উচিৎ প্রত্যুত্তর দেবো। আমাকে, আমার পিতা কে দেওয়া কথা পালন করতে দাও। প্রয়োজনে, তোমাদের তিন জনেরই সাহায্য আমার লাগবে। তোমরা আমাকে সাহায্য করার জন্য, নিজেদের সব রকমে উপযুক্ত করে, গড়ে তোল। "

শয়নকক্ষে, শকুনির কাছে আরুষি এলেন। -" কিভাবে পিতাকে দেওয়া শপথ পূর্ণ করবেন বলে ঠিক করেছেন

গান্ধার পুত্র ? আমার তো রাগে, সর্ব শরীরে অগ্নি প্রবাহ হচ্ছে।" বলতে বলতে আরুষি, বহুবৎসর পর, স্বহস্তে তাম্বুল সাজিয়ে স্বামীকে পরিবেশন করলেন পরম সযত্নে।

-" সে বিষয়ে, পিতাই আমাকে পথ দেখিয়ে গেছেন ,রানী আরুষি।"

-" কিভাবে ?"

-" কারাগারে বন্দী থাকতে, তিনি নিজে এক টুকরো করে খাদ্য নিতেন,আর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা দের এক টুকরো করে খাদ্য নিতে দিতেন। বাকি সব খাদ্য তিনি আমাকে খাইয়ে দিতেন। কারন, তিনি জানতেন, একমাত্র আমিই, তন্ত্র শক্তি সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছি। তাই, তিনি, আমার ওপর বিশ্বাস করে, ভার দিয়েছিলেন এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।"

-" কিন্তু, কিভাবে নেবেন প্রতিশোধ ? ওখানে, ভগিনী গান্ধারী আছেন ওনাদের হস্তে। ভগিনী গান্ধারী কি রাজি হবেন এই প্রতিশোধ নেওয়ায় ? ভগিনীর শতপুত্র ও কন্যা সহ সুখী পরিবার, তিনি কেন ধ্বংস হতে দেবেন তাঁর পরিবারকে, আপন ভ্রাতার হস্তে? "

-" তার জন্য তো প্রিয়া আরুষি, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে।"

-" কিভাবে মহারাজ ?"

-" প্রথমে, আগামী পরশ্ব, অমাবস্যা তিথিতে আমি তন্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে, পিতা ও জেষ্ঠ্য ভ্রাতা সকলের অস্থি সহযোগে, মন্ত্র পূত পাশা -ও তার দান ঘুঁটি তৈরী করবো।

এর জন্য, আগামী পরশ্ব, আমি সারাদিন অনাহারে থেকে পূজা ঘরে বন্দী থাকবো। তুমি বা কেউ আমাকে ডাকবে না বা আসবে না পূজা ঘরের ধারে- কাছে। সবাইকে বোঝাবার ও আটকাবার দায়িত্বভার তোমাকে নিতে হবে। সবাইকে এও বোঝাবে, যে আমি অস্থিবিসর্জনে একাই বার হয়ে গেছি। বিসর্জন দিয়ে এসে মন খারাপ। তাই, দ্বার রুদ্ধ করেছি।"

-" বেশ, তা না হয় হবে। তারপর ?"

-" তারপর, ছলা- কলা- কৌশলে আমাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে, চিরআশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিতে হবে এই তন্ত্র -পাশা সমেত। তারপর, ধীরে ধীরে চলবে আমার বিষ ছড়ানোর প্রক্রিয়া। সবার মন হরন করে নিয়ে, খুব সাবধানে ধীরে ধীরে লাগাতে হবে আগুন,যাতে,পুরো হস্তিনাপুর ও কৌরব বংশ সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথচ গান্ধারী কিছুই অনুভব করতে না পারে। আমাকে, এই কার্য শুরু করতে হবে শত ভাগ্নেকে হাতের মুঠোয় ভরে, ওদেরই দিয়ে। তাই, আমার এই গান্ধার রাজ্যের নরেশ হওয়া চলবে না। নরেশ জীবনের বিলাসিতা ভোগের জন্য আমার জীবন নয়। আমার জীবন, পিতা ও জেষ্ঠ্য ভ্রাতা সকলের কাছে, অন্ধকারের মধ্যে নেওয়া শপথ পালনের জন্য। সেই জীবন, হোক অপমানের, হোক ঘৃন্য, হোক নিন্দনীয়, তবু, সেটাই আমার পথ, সেটাই আমার গান্ধার রাজ্যের প্রতি দেশ ভক্তি ও রাজভক্তির পরিচয়।"

-" তার অর্থ আপনি পুনরায় চলে যাবেন! গান্ধার নরেশ হয়ে সিংহাসনে বসবেন না !" -"না, আরুষি। তুমি যেমন,

উলুকিকে দিয়ে এতোদিন গান্ধার দেশ চালিয়েছো, যার জন্য তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, তুমি যথার্থ গান্ধার কন্যা ও রাজভক্ত। রাজরক্তের অস্তিত্ব আছে, তোমার শরীরের প্রতিটি শিরায়। যার প্রমাণ তুমি দিয়েছো তোমার প্রতিটা কাজে। যার জন্য, আমি সহ পুরো গান্ধার রাজপরিবার ধন্য ও গর্বিত সেই সাথে অবশ্যই কৃতজ্ঞ, তেমন ভাবেই তুমি ভবিষ্যতেও দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।আর এবার তো উলুকি বড় হয়েছে। আমি হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়ার আগে ওকে গান্ধার সম্রাটের পদে অভিষেক করে যাবো, সঙ্গে ওর রাজত্ব লাভের কথা ঘোষনা করে দিয়ে যাবো। "

আরুষির চোখে জল চলে এলো।

-" কেঁদো না প্রিয়া, আমি ইচ্ছা মতো, মাঝে মাঝে আসবো গান্ধাররাজ্যে, থাকবো কিছুদিন করে, তোমার সাথে কাটাবো কিছু সময়- কথা দিলাম। তুমিও কথা দাও, তুমি শক্ত হয়ে আমাকে আমার জীবনের কঠিন ব্রত পালনে সাহায্য করবে। আমার আরো দুই পুত্রকেও উলুকির মতো সর্ব গুণান্বিত করে বড় করে তুলবে, যাতে ওরাও যেন একাধারে যুদ্ধ করতে পারে ও রাজ্য সামলাতে পারে। "

-" বেশ, কথা দিলাম গান্ধার পুত্র, আমার স্বামী, আমারপ্রভু।" আরুষির গলা বন্ধ হয়ে এলো বেদনায়।

-" পুত্র উলুকি, কাল তোমার অভিষেক হবে গান্ধার নরেশ হিসাবে। তোমার বাবা স্বয়ং তোমার অভিষেক করিয়ে যাবেন।"

-" যাবেন! কোথায় যাবেন? তিনি এই গান্ধার রাজ্যের অধিপতি হবেন না ? এই তক্ষশীলার সিংহাসনে তিনি অধীশ্বর হবেন না ?"

-" না পুত্র, আমাকে চলে যেতে হবে হস্তিনাপুর। পিতাকে দেওয়া শপথ পালনের জন্য। তাই, আমার এই প্রিয় তক্ষশীলার সুরক্ষা ও পরিচালনার ভার আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই সর্বসমক্ষে। ঘোষনা করে যেতে চাই এখানকার সম্রাট হিসেবে।" বলতে বলতে শকুনি তাঁর পরম স্নেহের হাত রাখলো উলুকির মস্তকে। -" শুধু একটাই আবদার পুত্র, আমি যখনি তোমার সাহায্য চাইবো, তুমি সসৈন্যে চলে এসো আমার পাশে, পিতামহ ও গান্ধার রাজ্যের অপমানের প্রতিশোধ পালনে।"

-" নির্দ্বিধায় চলে যাবো পিতা। আপনাকে এ আপনার পুত্র উলুকির বচন।"

গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো দুজনে দুজনকে।

-" এ কি শুনছি পুত্র! তুমি আবার আমাদের ফেলে, এ গান্ধার ফেলে চলে যাবে !"- আর্ত কন্ঠে রাজমাতার স্বর ভেসে এলো।

-" কে বলেছে মাতঃ, আমি তোমাকে ও গান্ধার কে ফেলে চলে যাবো ? আমি কাজে যাবো মা। আর, মাঝে মধ্যেই ছুটি পেলে ছুটে আসবো এখানে। তুমি একবার ডাকলেই আমি তোমার সামনে এসে হাজির হবো মাতঃ।" বলে, পুত্র শকুনি,পরম আদরে, মা কে, তার ঘরে নিয়ে গেলো। কতক্ষন গল্প করলো মা এর সাথে। উলুকি

তার মা আরুষির সাথে গেলো আরুষির কক্ষে। ছোট দুই ভাই তখন কক্ষের বাহিরে, উঠান প্রাঙ্গণে, অসিযুদ্ধে মত্ত। আরুষি উলুকিকে বললেন, -"এদের সব দিক থেকে পারদর্শী করে তুলতে হবে,আর তার জন্য, পুত্র আমার, তোমার সাহায্য প্রয়োজন। "

-" আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মাতঃ । আমি আপনার পাশে, আপনার সাহায্যে, সব সময় হাজির। আমি, আমার দুই ভ্রাতাকে সর্ব গুণে, গুণান্বিত পারদর্শী করার দায়িত্বও নিলাম।"

-" আমি নিশ্চিন্ত পুত্র। তৈরী থেকো, কাল তোমার অভিষেক।"

বলে, আরুষি কক্ষান্তরে গমন করলেন । উলুকি তখন দুই ভ্রাতার কাছে গিয়ে নির্দেশ দিল,

-"এসো, তোমরা দুজনে আমায় হারাও দেখি।" আর তারপরই ঝনঝন শব্দে চললো প্রস্তুতি - প্রতিশোধের, অভিষেকের, ভবিষ্যৎ এর।

আজকের যশোদা

_____________ "অন্ধকারে একা ঘরে নিজেকে এভাবে আটকে রেখে কি করবে? তোমার কৃষ্ণ এখন বড় হয়ে গেছে।আর ওর জন্য মন খারাপ করে থেকো না।" বিজয় বাবুর হাতের স্পর্শে, দেবীকার দুচোখ আর বাধ মানলো না। সদ্য ছেলে যুদ্ধে গেছে। দেশের হয়ে লড়তে গেছে। বীর পুত্রের মাতা দেবীকা এখন নিছকই, মা যশোদা।

-" কে জানে, ছেলেটা এখন কি করছে ? কোনদিন তো, আমার হাতের রান্নাছাড়া খেতে পারে না। এখন আর ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছে কিনা জানতেও পাচ্ছি না! "

-" করবে করবে। আরে ও তো একা যুদ্ধে যায়নি। ওর সাথে, বলরামের মতন দেশের আর সব সৈন্য ভাইরা আছে। তুমি শুধু শুধু ওর জন্য দুশ্চিন্তা করে মন খারাপ করো না। ওর সাথে মোবাইল আছে তো। ফোনে কথা বলবে, ভিডিও করবে। রোজ খবর নেবে।"

-"সেই কতদূর গেলো ছেলেটা ! এখানে ? কার্গিল! কত হাজার মাইল দূরে!" দেবীকা দেবী নিজের মনেই বলে উঠলেন।

-" হোক না। এই জীবনটা তো ও, স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে।"

-"যখন মেডিকেল পড়লো,তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম, যে, ও সৈন্যদের ডাক্তার হয়ে কাজ করবে !" -" কতবড় মহান দায়িত্ব ও কাঁধে নিয়েছে বলো তো। যুদ্ধক্ষেত্রে, অসহায় আহত সৈন্যদের, সেবা ও ডাক্তারী করে, সুস্থ করে কেউ না তুললে, সৈন্যরা লড়াই চালাবে কি করে? যুদ্ধে জিতবে কি করে ? তাই ও তো এক প্রকারের যুদ্ধেই সামিল হতে গেছে।"

-" সেটাই তো ভয়ের। শত্রু পক্ষের একটা বোমায়, যে কোন সময় যদি গুঁড়িয়ে যায় ওদের ছাউনি, তাহলে আমার ছেলেটা বাঁচবে কি করে?"

-" কেন অশুভ চিন্তা করছো ? অমঙ্গলের কথা ভেবো না। পজিটিভ থিঙ্কিং করো সবসময়। তুমি ভুলে যাচ্ছো ওর নাম - কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বিহারী সেন। আমার বাবা ওর নাম রেখেছিলেন। তাই তোমাকে আমি আদর করে যশোদা বলে ডাকি। আর ওকে-কৃষ্ণ। এবার মনকে, শান্ত করো আমার কৃষ্ণের যশোদা মা।"

চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে, আলুথালু পোশাক গুছিয়ে নিলো দেবীকা।আজ আর কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কাজের মেয়েটাও ছুটি নিয়েছে। তাই, বাধ্য হয়ে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার টা হাতে টেনে নিলেন দেবীকা। তারপর, ওয়াশিং মেশিনটা সেট করে কৃষ্ণের ছেড়ে যাওয়া জামা কাপড়গুলো ফেলতে লাগলেন মেশিনে। ফেলার আগে, জামাগুলো চেক করে, কৃষ্ণের গায়ের

গন্ধ টেনে নিয়ে একটা আদর মাখানো চুমু দিলেন জামাগুলোতে।

-"আজ আর রান্না বসাতে হবে না তোমাকে। আমি, হোম ডেলিভারীতে খাবার অর্ডার করে দিচ্ছি। দুবেলাই। কাল যা করার ক'রো।"- বললেন বিজয় বাবু। -" যা ভালো বোঝ কর। আমার কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না।" দেবীকার নিস্পৃহ উত্তর।

-" সেই জন্যই তো বলছি। হ্যাঁ, হ্যালো, রিমঝিম হোমডেলিভারী?."....বলতে বলতে বিজয় বাবু উঠে চলে গেলেন পাশের ঘরে। ছেলে অমৃতসরের এয়ারপোর্টে পৌঁছে, মা কে একটা ফোন করলো। -"মা, তুমি কেন অধীর হচ্ছো? আমি তো আগেও কতবার এভাবে বেরিয়েছি। নিজেকে শান্ত করো মা। আমি তোমাকে রোজ ফোন করার চেষ্টা করবো, যদি সুযোগ থাকে। কথা দিচ্ছি মা। তুমি বাবাকে দেখো। তোমার ভরসাতেই বাবাকে রেখে এসেছি, আর তুমি ভেঙে পড়ছো? আমি এখন রাখি। কাশ্মীরের ফ্লাইটে, কাশ্মীর পৌঁছে ফোন করবো। "

ফোন রেখে দেবীকা উঠে পড়লেন। আঁচলে চোখের জল মুছে, ঘরের কাজে লেগে গেলেন। বিজয় বাবু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন -" ছেলে কতদূর পৌঁছালো ? "

- বিছানায় চাদর পাল্টাতে পাল্টাতে উত্তর দিলেন দেবীকা-" বল্লো তো অমৃতসরের এয়ারপোর্টে। কাশ্মীর পৌঁছে ফোন করবে।" বিরাজবাবু গায়ে, পাঞ্জাবী গলিয়ে, বার হয়ে পড়লেন। কিছু কেনাকাটা করে আসবেন, সেই সাথে মাতৃ মন্দিরে, ছেলের জন্য একটা পূজা প্রার্থনা ও

মানতও করে আসবেন ঠিক করলেন। কাশ্মীর পৌঁছে ছেলে জানালো,- ওদের পিক-আপ করতে পিক-আপ ভ্যান আসবে লেহ নিয়ে যেতে। সেখান থেকে কার্গিলস্পট। প্রায় জনা দেড়শো মতন যাচ্ছে ওরা একসাথে। ওর সাথে আরেকজন ডাক্তারও যাচ্ছে।সঙ্গে মেডিকেল ইউনিট। ওষুধ -পত্র, ফার্স্টেড সরঞ্জাম, কিছু ফোল্ডিং খাট, বিছানা, অপারেশনের জিনিসপত্রের যা যা যোগাড় হয়েছে, সবই যাচ্ছে ওদের সাথে। চিন্তার কিছু নেই। কার্গিল পৌঁছে ফোন করবে। ফোন রেখে দেবীকা রাগে গর্ গর্ করে, পাকিস্তানের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে লাগলেন। আর বিজয় বাবু, সোফায় বসে, খবরের কাগজে মুখ ঢেকে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। দেবীকা পরদিন জানালো, ছেলে ফোন করে জানিয়েছে যে, ও কার্গিল পৌঁছে গেছে। কার্গিলএর পাকিস্তান বর্ডারে, টলোলিং ও টাইগার হিল এরিয়াতে, ওদের ক্যাম্প হয়েছে। আর যুদ্ধ চলছে জাস্কার রেঞ্জ, কার্গিল এরিয়াতে। আহত সৈন্যদের নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের ক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য। বিজয় বাবু অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন --" আর কি বললো ছেলে?"

দেবীকা জানালো, -" বললো, জায়গাটা খুব উঁচু। প্রায়, চোদ্দ হাজার -থেকে আঠারোহাজার ফুট নাকি কত আমার মনে নেই। পাহাড়ী দুর্গম এলাকা। রুক্ষ, শুষ্ক আর খুব খুব ঠাণ্ডা। শীতে ও ঠান্ডায় কেউ কথা বলতে পর্যন্ত পারছে না, তো যুদ্ধ করবে কি। ভাগ্যে কি যে আছে ছেলেটার তা এক ঈশ্বরই জানেন! কেমন থাকবে কে জানে !"

-" অত চিন্তা করছো কেন ? যাওয়ার আগে তো, ওরা ওইসব এলাকায় থাকতে গেলে কি করতে হবে, সে ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছে। তাহলে এতো ভয় পাচ্ছো কেন? আর, ও তো বেড়িয়ে বেড়াতে যায় নি। ক্যাম্পেই তো থাকবে।" রাস্তায় বার হলেই, বিজয় বাবু আর দেবীকাকে , সবাই জিগ্গেস করছে, ছেলের কথা -"কৃষ্ণের কি খবর? কেমন আছে?" এদিকে, যুদ্ধ চলছে, টানটান উত্তেজনায়। টেলিভিশনের সংবাদ আর খবরের কাগজে, মোবাইলে অনবরত খবর আসছে। তবু, তারই মধ্যে, দিনে একবার করে ফোন আসে কৃষ্ণের। -" মা, জানিনা কতদিন ফোন করতে পারবো? নেটওয়ার্ক খুব বাজে। ওয়েদার এতো খারাপ! তুমি একদম চিন্তা করবে না। ঠিকঠাক বাবাকে মেডিসিন খাওয়াবে। দেখবে।" আবার কখনো ফোন আসে, -"মা, একদম সময় পাচ্ছি না। এতো সৈন্য আহত, মৃতপ্রায় হয়ে আসছে এখানে যে অল্প ব্যবস্থায় যতটা পারছি, বাঁচাবার চেষ্টা করছি। তবু, যখন পারছি না, খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতো রক্ত, এতো চেনাবন্ধুর মৃত্যু, এতো আড্ডা-হাসি হঠাৎ স্মৃতি হয়ে যাওয়ার আঘাত আমাকে দিশাহারা করে দিচ্ছে।"

বিজয় বাবু, ছেলেকে, মানসিক শক্তি দিয়ে বলছেন নানান কথা--" বাবু, এরই নাম যুদ্ধ। তুই প্রথম দেখছিস না তো। নিজেকে শক্ত কর, বাবু। তোর ওপর ওরা সবাই ভরসা করে আছে। আর, আমরা ভরসা করে আছি ওদের উপর। তুই ভরসা কর-ভগবানের ওপর। তুই ভেঙে পড়লে, ওরা লড়াই চালাবে কি করে? "

-" ঠিকই বলেছো বাবা। আমি রোজ সকালে আমার পেশেন্টদের সুস্থতা প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। মাতা রানীর কাছে। আর নিজের জন্য মানসিক শক্তি প্রার্থনা করি, যাতে ওদের ঠিকঠাক সেবা করতে পারি।"

-" হ্যাঁ বাবা, রোজ এভাবে মাতা রানীর কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নিবি।" এভাবেই চলতে লাগলো ছেলের সাথে, বাবা-মায়ের যোগাযোগ। দিনগুলো শুধুকেটে যাচ্ছে। না আছে খাওয়ার ইচ্ছা, না কথা-গল্প- যোগাযোগের ইচ্ছা অন্যদের সাথে। সারাদিন শুধু অধীর অপেক্ষা - কখন ফোন আসবে কৃষ্ণের! খবর আসছে, দলে দলে বীর শহীদদের কফিন বন্দী করে আনা হচ্ছে এয়ারপোর্টে। দেবীকা যত খবরে জানছেন, শুনছেন, তত অধীর হয়ে উঠছেন - কবে যুদ্ধ শেষ হবে! কবে ছেলে আসবে! হঠাৎ একদিন দুপুরে, ফোন বেজে উঠলো। বিজয় বাবু, ছেলের ফোন ভেবে যথারীতি ফোন তুলে "হ্যালো" বললেন। ওপাশ থেকে খবর এলো, ইন্ডিয়ান রেজিমেন্ট থেকে জানালো, ডঃ কৃষ্ণ বিহারী সেন কে, কাল রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওনার মোবাইল ফোন ক্যাম্পেই আছে। সেখান থেকেই ফোন করে জানানো হচ্ছে খবরটা। যতদূর সম্ভব বলে সন্দেহ হচ্ছে, পাকিস্তানীরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে ওঁনাকে। ইন্ডিয়া গভর্মেন্টকে জানানো হয়েছে সংবাদটা। এটুকু বলেই ফোনটা কেটে গেলো। বিজয় বাবু তবুও, ফোন হাতে নিয়ে ভ্যাবলার মতন দাঁড়িয়ে থাকলেন। কোনকথাই ঠিক বোধগম্য করতে পারছিলেন না। এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ, লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা - দেবীকা

দেবী। উনি, স্বামী কে, বসিয়ে, জল খাইয়ে, মাথায় চোখে জল দিয়ে মুছিয়ে সুস্থ করলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন -" ছেলে কি বললো যে তুমি এরকম হয়ে গেলে ?"

বিজয় বাবু এবার জানালেন সব কথা। দেবীকা দেবী আর নিজেকে ধরে রাখতেপারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। কি করা উচিৎ বুঝতে না পেরে, দুজনেই থানায় গিয়ে সব জানালেন। থানা থেকে আশ্বাস দেওয়া হলো যে, তারা সঠিক খবর আনার চেষ্টা করছেন, যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। কৃষ্ণের নিখোঁজ হওয়ার পর, কেটে গেলো- প্রায় এক মাস। যুদ্ধ ততক্ষণে থেমে গেছে।যারা যারা জীবিত- সবাই ফিরে এসেছে। ফিরলো না কেবল কৃষ্ণ। বিজয় বাবু ও দেবীকা দেবী মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সরকার থেকে তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। ডাক্তার, পুলিশ সবাই তাদের পাশে থাকছেন সবসময়।হঠাৎ এক বিষন্ন গোধূলি বেলায় মোবাইলটা আবার বেজে উঠলো। পুলিশ ফোন ধরে দেখলো-কাশ্মীরের পাকিস্তান বর্ডার থেকে একটা নম্বর। ফোনটা পুলিশ রিসিভ করে স্পিকারে দিয়ে বিজয় বাবু কে দিলেন।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো কৃষ্ণের গলা -"হ্যালো,বাবা?মা? আমি কৃষ্ণ বলছি। তোমরা ঠিক আছো? জানি ঠিক থাকার কথা নয়। আমি ঠিকআছি । তোমরা চিন্তা করো না। আমি এখনই যেতে পারছি না। সময় হলে যাবো।" বিজয়বাবু জিগ্গেস করলেন--" তুই কোথায় বাবা-

পাকিস্তানে? কিডন্যাপ হয়েছিস? ওরা তোকে মারছে ? অত্যাচার করছে ?"

-" না বাবা। আমি কিডন্যাপ হয়েছি ঠিক, কিন্তু,ওরা আমাকে অত্যাচার করছে না। তবে, ওদের কথা না শুনলে, মেরে দেবে। ওরা আমাকে একটা গ্রামে এনে নজরবন্দী করে রেখেছে। কারন, ওদের এখানে ভালো ডাক্তার নেই। ওরা আমাকে দিয়ে ওদের গ্রামে ডাক্তারী করাচ্ছে। যদি, ওদের ডাক্তারী না করে, পালানোর কথা ভাবি- তাহলে আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। আমাকে দিয়ে ডাক্তারী করানোর সাথে সাথে, ওরা আমাকে ওদের ছেলে মেয়েদের ডাক্তারী শেখাতেও বলছে।যতটা পারছি করছি। ওরা যেদিন বুঝবে, আমার আর প্রয়োজন নেই, সেদিন আমাকে ছেড়ে দেবে।মারবে না। কিন্তু, এখন কাউকে বলা যাবে না আমি কোথায়। তাহলেই আমি শেষ হয়ে যাবো। ওরা আমাকে ফোনে তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে দেবে বলেছে, যদি তোমরা ওদের সহযোগিতা করো। তাই, আমার এই নম্বরটা তোমরা সেভ করে নাও। আর, প্লিজ বাবা, আমাকে আবার দেখতে চাইলে, কাউকে কিছু ব'লো না।"

কিছু আর বলার আগেই ফোনটা কেটে গেলো। বিজয় বাবু ফোনটা পুলিশের দিকে এগিয়ে দিলেন। পুলিশ নম্বরটা সেভ করে নিলেন নিজের ফোনে ও বিজয় বাবুর ফোনে। তারপর, বিজয় বাবু কে বললেন -" চিন্তা করবেন না। আমিও এক ছেলের বাবা। আমি আপনাদের বুঝতে পারছি। আপনার ছেলের কোন ক্ষতি আমি হতে দেবো না।" পুলিশ চলে গেলে, দেবীকা দেবী

কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বিজয় বাবু, দেবীকা দেবীর মাথায় হাত রেখে বললেন-" মাতা রানীর ওপর ভরসা রাখো। ওর কোন ক্ষতি হবে না।দেখলে তো, ও বেঁচে আছে। কত লোকে কত ভয় দেখিয়েছিলো। মাতা রানী খবর দিলেন, আমাদের সন্তান তাঁর হেফাজতে আছে। সন্মানের সাথে-আছে। মাতা স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করছেন।" দেবীকা অভিমানী সুরে বললো -" মাতা কি বুঝতে পারছেন না যে আমিও একজন মা। আমার মনের কি অবস্থা হচ্ছে তা কি মায়ের একবারও মনে হচ্ছে না!"

-" বুঝতে পেরেছেন বলেই তো তিনি, প্রমাণ সমেত খবর পাঠিয়েছেন, যে আমাদের ছেলে বেঁচে আছে। এটাই তো আমাদের পরম আনন্দের প্রাপ্তি। আর, ছেলে বড় হয়ে কাজে গেছে মনে করে নাও। মাতা রানীর কাছে, কি ভারত, কি পাকিস্তান।সবাই মা এর সন্তান। তাই, মা তার অসহায় সন্তানদের সেবা কার্যে আমাদের সন্তানকে নিয়োগ করেছেন ভেবে নাও। শুধু দেখতে হবে, যেন, আমাদের সন্তান, ভারতমাতা কে না ভুলে যায়, কোনরকম বিশ্বাস ঘাতকতা না করে ভারতের সাথে। তাহলেই, আমাদের আজকের গর্ব, চিরদিনের গর্ব হয়ে উঠবে। "

-" কতদিনে আসবে আমার বাবু আমার কোলে ? কতদিনে আসবে কৃষ্ণ ভারতমাতার কোলে ফিরে ?"

-" মাতা রানী যখন মনে করবেন। তুমি মাতা রানীর ওপর ভরসা রাখো। উনি যখন খোঁজ দিয়েছেন, তখন ঠিক ফিরিয়ে দেবেন।" দুজনে একসাথে বলে উঠলেন-" হে মাতা রানী, হে বৈষ্ণোদেবী, আমাদের সন্তানকে রক্ষা

করো মা, আমাদের সন্তানকে তুমি নিজ দায়িত্বে আগলে রেখো। আমাদের কাছে, আমাদের ভারতে ফিরিয়ে দাও।" কেটে গেলো বেশ কয়েক বছর। এর মধ্যে পুলিশ ট্রেস করে দেখে নিয়েছে কৃষ্ণের লোকেশন। এক পাহাড়ী দুর্গম গরীব গ্রামে কৃষ্ণ বন্দী। সরকার অনবরত কথা চালাচ্ছে, গোপনে, যাতে ওই গ্রামে বেশ কিছু উপযুক্ত ডাক্তার পাঠিয়ে, কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে আনা যায়। আলোচনা আর সফল হচ্ছে না। পরিবর্তে ওরা, ভয়ঙ্কর জঙ্গির মুক্তি চাইছে। তাই কথা শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে মা -বাবার সাথে ছেলের। এখন বাবা-মাও, ছেলে বেঁচে আছে দেখে, নিজেদের হতাশা ও অসুস্থতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। একদিন কৃষ্ণ জানালো -" মা, তোমাদের জানানো হয় নি, আমি এখানে ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক বন্দিনী নার্সকে বিয়ে করেছি।ওর নাম পুণম।ও পাঞ্জাবী মেয়ে। তোমরা রাগ করো না তোমাদের না জানিয়ে, বিয়ে করেছি বলে।প্লিজ, ক্ষমা করে দিও। খুব শিগগিরই, আমরা হানিমুনে যাবো ভারতে। পাসপোর্ট, ভিসা করিয়ে নিচ্ছি দুজনের।" বিজয় বাবু আর দেবীকা দেবী তো যেমন আনন্দ পেলেন - ছেলে আসবে শুনে, তেমনি আঘাত পেলেন একমাত্র ছেলের বিয়ের খবর পেয়ে। তবু, সব খবর পুলিশের সেই ভদ্রলোককে জানালেন। দুদিন পর, কৃষ্ণ আবার ফোনে জানালো-, ওরা ,ভারতে যাওয়ার, পারমিশন পায়নি। তাই ,ভারতে কৃষ্ণের এখনি আসা হবে না। বিজয় বাবু ততদিনে একটা ল্যাপটপ কিনে ফেলেছেন। ল্যাপটপে ছেলেকে চোখের দেখা দেখার অনুরোধ জানালেন। ওরা রাজি হলো। কিন্তু,

নেটওয়ার্ক পাওয়া গেলো না। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ছয় মাস পর, আবার কৃষ্ণের ফোন এলো।

-" মা, আমি আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে এসেছি। তোমাদের বৌমাকে নিয়ে। এখানে নেটওয়ার্ক ভালো। এখন এখানে রাত, মানে ভারতে এখন দিন।বাবাকে বলো ল্যাপটপ খুলতে। চলো, তোমাদের চোখের দেখা দেখি।" বিজয় বাবু পড়িমড়ি করে এসে ল্যাপটপ নিয়ে বসলেন। দেখা হলো ছেলের সাথে। যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পর। কেউ আর কথা বলতে পারছেন না। শুধুই সবাই সবাইকে দেখতে লাগলো। অনেক ক্ষণ পর, কৃষ্ণ বললো-" জানো, আমার তত্বাবধানে ডাক্তারী শেখানোর প্র্যাকটিস ভালোই হচ্ছে ওখানে। ওরা, অনেকটাই সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। মোটামুটি, আর দুই - এক বছরেই, আমি ওখানে একটা ভালো হাসপাতাল খুলে ফেলতে পারবো। তখন একবার কথা বলবো, যদি আমাকে ওরা ভারতে ফেরত পাঠায়। চিন্তা করো না। আমি সবসময় তোমাদের হয়েই আছি। আর, এই দেখো মা, তোমাদের বৌমা। পুনম। পুণম, আমার বাবা-মায়ের সাথে আলাপ করো।" -" নমস্তে পিতাজী, নমস্তে মাতাজী। আমি আপনাদের কথা শুনেছি। কিছু বাংলা বলতেও শিখেছি। ভুল হলে মাফ করে দেবেন।" পুণম, দেখতে খুব মিষ্টি একটা মেয়ে। বিশেষ করে ওর চোখ দুটো বড় মায়াবী। ওর ব্যবহার, কথাবার্তাও নম্র, বিনয়ী। পছন্দ হলো বিজয় বাবু ও দেবীকার। ছেলেকে বললো, -"এভাবে মাঝে মধ্যেই ল্যাপটপে দেখা ও গল্প করিস বাবু। আমাদের মনটা একটু শান্ত হয়, আনন্দ পাই। বয়স হয়েছে, কবে বলতে কবে কি হয়! তখন তোকে দেখার,

কাছে পাওয়ার তৃষ্ণা নিয়েই মরে যেতে হবে। ভূত হয়ে তখন থেকে যাবো তোদের কাছে।" সবাই হেসে উঠলো। "বাই" বলে, ল্যাপটপ বন্ধ করলো ছেলে।বাবা-মার চোখে লেগে থাকলো আনন্দের ঘোর।

-" দেখলে তো দেবীকা, বলেছিলাম না, মাতা রানী, ঠিক আমাদের কৃপা করবেন। হয়তো, সময় লাগছে। কিন্তু, নিভে যাওয়া আশার দীপ, আবার তিনি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, একটু একটু করে। "

-" জয় মা বৈষ্ণোদেবী, জয় মাতা রানী।" দেবীকা মাতার উদ্দেশ্যে মাথায় হাত ঠেকালো। এভাবে, আশায় আশায় কেটে গেলো আরো দুই বছর। ছেলেকে পাওয়ার সাধ মেটে ল্যাপটপে। দুধের সাধ ঘোলেই মেটে। এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে যায় পিতৃ-মাতৃ হৃদয়। ছেলে জানায় সে একটা হাসপাতাল খুলেছে গ্রামে। ওদের দুই যমজ পুত্র সন্তান হয়েছে। সবাইকে নিয়ে কৃষ্ণ আসবে খুব শীঘ্রই। একদিন বিজয় বাবু, বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখলেন, বাড়ি ফিরতে পারছেন না। রাস্তাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ, এক পুরোনো পরিচিতের সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনিই, বিজয় বাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। দেবীকা দেবী, সন্ধ্যায় বললেন, -"চলো না, ল্যাপটপ খোলো, নাতি দুটোকে দেখি। কি মিষ্টি দেখতে হয়েছে। আর দুষ্টুমীতে আমাদের কৃষ্ণের মতন হলো কিনা দেখি একটু ?" -"কৃষ্ণ কে ? " বিজয় বাবু, ল্যাপটপের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। দেবীকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন বিজয় বাবুর দিকে। তারপর চললো ডাক্তার, ওষুধ, বাইরের কাজ,

ঘরের কাজ। দেবীকারও তো বয়স বাড়ছে। আর পেরে উঠছেন না। ছেলেকে ফোন করে যে বলবেন, সেসময়ও পাচ্ছেন না। একদিন অনেক চেষ্টার পর, সময় বার করে, তিনি নিজেই ল্যাপটপ খুলে ছেলেকে ধরলেন। বাবার অবস্থা দেখালেন। ছেলে বললো, দেখি, খুব শিগগিরই আমাকে কিছু একটা করতে হবে। এক সপ্তাহ পর, ছেলে জানালো, -"আমাকে ওরা, কিছুদিনের জন্য ভারতে ছাড়ার পারমিশন দেবে বলছে। দেখি, তোমাদের এখানে আমার কাছে নিয়ে এসে রাখার পারমিশন পাই কিনা।"

-"এ বাড়ির তাহলে কি হবে সোনা! এটা তোর দাদুর বাবার বানানো বাড়ি।"

-" সেটাই তো ভাবছি। আর ওরাই কি পারমিশন দেবে ?
- আমাকে এবার ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার পারমিশন চেয়ে দেখবো। " ল্যাপটপ রেখে দেবীকা বিজয় বাবুর জন্য খাবার গরম করতে গেলেন। বিজয় বাবু এখন নিজে নিজে খেতেও ভুলে গেছেন। দেবীকাকে খাইয়ে দিতে হয়। ছয় মাস পর, ছেলে কৃষ্ণ ফোনে জানালো, -" মা, আমি দেশে আসছি। ওরা আমার স্ত্রী পুণমকে আর আমার দুই ছেলেকে, ওদের কাছে জমা রেখে, আমাকে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছে। তাও, এক সপ্তাহের জন্য। দেরী করলে ওরা আমার ছেলেদের আর স্ত্রীকে মেরে দেবে বলছে। ওদের কথা মেনেই আমি যাচ্ছি, তোমাদের কাছে। আলোচনা করে, কিছু একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় তোমাদের জন্য সেই চেষ্টাই করছি।"

আর আশা করতে ইচ্ছে করলো না দেবীকার । বিজয় বাবু তো কিছু বুঝলেনই না। যিনি বুঝলে, শুনলে,

সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, তিনিই এখন সব বোঝাশোনার বাইরে। তাই রোজকার মতই জীবন কাটতে লাগলো দেবীকার। তবু, বাড়ী ফেরার দিনটা, দেবীকা, ছেলের ঘরটা গুছিয়ে রাখলেন। নতুন চাদরে, বালিশের কভারে বিছানা সাজালেন। ছেলের পড়ার টেবিলটা সুন্দর পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখলেন। ঘরের ঝুল-নোংরা পরিস্কার করে ঝকঝকে করে তুললেন। জানালা-দরজায় নতুন করে পর্দা টাঙালেন। ঘরটাকে একটা নতুন চেহারা দিলেন যেন। ছেলের পছন্দের খাবার বানালেন দেবীকা, নিজে হাতে। তারই সাথে, স্বামীর সেবা। বয়স হয়েছে দেবীকার। আজকাল একটু বেশি পরিশ্রম করলেই, কেমন যেন দম আটকে আসে। সেরকমই ক্লান্তি লাগছিল আজ তাঁর। সব কাজ সেরে, দুপুরে বসে, একটু বিশ্রাম সেরে নিচ্ছিলেন । কখন চোখ লেগে গেছিল কেজানে! হঠাৎ ধপ্ করে একটা আওয়াজে চোখ মেলে দেখলেন, বিজয় বাবু বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে, পা জড়িয়ে পড়ে আছেন মেঝেতে। অজ্ঞান হয়ে গেছেন। দেবীকার মাথাটা ঘুরতে লাগলো। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল। কতক্ষন এভাবে কাটলো কে জানে! হুঁশ ফিরলো "মা"" মা" ডাকে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন তার আদরের, বহু প্রতীক্ষিত একমাত্র ছেলে, একমাত্র সন্তান - কৃষ্ণ। জড়িয়ে ধরলেন দেবীকা ছেলেকে, পরম স্নেহে। তারপর সব মনে পড়লো।ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। -" তোর বাবা! তোর বাবা কোথায়!" বলে আকুল হয়েউঠলেন।
কৃষ্ণ, পরম আদরে মাএর পিঠে হাত রেখে বললো,- "বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভয় পেয়ো না।

আমি তো এসে গেছি।" রাতেই খবর এলো, বিজয় বাবু, এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন দেবীকা। আবার চারিদিক অন্ধকার কালো হয়ে আসছে। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেটে লিখলেন - "ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক"। কৃষ্ণ, হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে বাড়ি ফিরলো পরদিন সকালে। কাজের মেয়েটা দরজা খুলে বললো, -"মাসীমা তো সেই রাত থেকেই বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। কিচ্ছুটি খায়নি রাত থেকে। দাঁড়াও ডাকছি।"

কৃষ্ণ বললো,-"তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি।" বলে ডেকে উঠল -"মা,মা," কোন শব্দ নেই। ডাক্তার এসে জানালেন - ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাক। কৃষ্ণ বসে থাকলো পুরো একটা বেলা। দুপুরের মধ্যেই সব আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীরা এসে দাঁড়ালো। দুজনের শব এক সাথে সেজে উঠলো, যেন পরপারে দুজনে হাত ধরাধরি করে হানিমুনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন।
সব পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে, কৃষ্ণ চললো এয়ারপোর্টে। সবাই বললো, বাড়িটার কি গতি হবে?

কৃষ্ণ বললো, বাবা-মা থাকলো তো। আমি আসবো, আমি ফিরবো। একদিন নিশ্চয়ই ফিরবো।

প্লেন টেক অফ করলো।

সেদিনের কথা

____________ নোরা, তখন স্নান সারতে ঝর্নায় গিয়েছিলো। হঠাৎ, দেখতে পেলো, একটা বড় মাছ সাঁতার কাটছে। -" আরে, একটা বড় মাছ না!" ভেবেই নোরা,খপাৎ করে হাত দিয়ে মাছটা ধরে, নিয়ে এলো গুহায়। সাথে সাথে, এবড়োখেবড়ো হলুদ দাঁত বার করে, এক মুখ হেসে , এগিয়ে এলো সুসি। গুহায় তখন আর কেউ নেই। অন্যরা গেছে শিকারে। সুসি তাই বিবস্ত্রা হয়ে শীতলতার স্বাদ নিচ্ছিলো। নোরা, মাছটা গুহার এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে, ইশারায় দেখিয়ে দিল মাছটা। তারপর, গুহার আরেক পাশে, ধুয়ে রাখা, হরিণের চামড়াটা, গায়ে জড়িয়ে নিল। সুসি,মায়ের ইশারা বুঝে নিয়ে, ওই বিবস্ত্রা হয়েই, আগুন জ্বেলে, মাছটাকে পোড়াতে লাগলো। নোরা, গুহার দরজায় একটা পাথরের ওপর বসে রোদের তাপ নিতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর, নোরা দেখলো, দূরে,বড় উঁচুপাথরের পাশে, যেখানে ও সযত্নে সেদিন, পেঁপের দানাগুলো ফেলে, মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিলো, সেখানে, বেশ কিছু গাছ হয়েছে, খুব ছোট ছোট। পাতা আছে সে গাছটায়, চওড়া খাঁজ কাটা। একমনে গাছগুলো দেখছিলো নোরা। এক হাত সমান উঁচু হবে। এমন সময় ,দল বেঁধে ফিরে এলো নোরার ছেলে - মেয়েরা। কাঁধে একটা মরা মহিষ। ওদের আওয়াজ শুনে,সুসি,গায়ে চিতার ছালটা জড়িয়ে নিলো।

তারপর, সবাই কে, বড় পাতায় পোড়া মাছটার টুকরা সাজিয়ে খেতে দিলো।   সুসি , নোরার বড় ছেলে পিচের বান্ধবী। ওদের সাথেই এখন থাকে। যতদিন ইচ্ছা থাকবে, তারপর চলে যাবে যেখানে যেতে মন চাইবে। নিজের থেকেই সুসি, গুহা পরিষ্কার করা, সকলের সেবা করা, সবাইকে খেতে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। নোরার বয়স হয়েছে। তাই, নোরাও আর কিছু বলে না। সুসি কে নিজেদের দলেরই একজন বলে মেনে নিয়েছে। সুসির এই একদলে থাকাটা, নোরার অন্য ছেলে-মেয়েরা পছন্দ করে না। অযথা, খাবারের ভাগ দিতে হয়। তবু, নোরা কিছু বলেনা, তাই, অন্যরাও কিছু বলতে পারে না।

সকালে সুসি,নিজে জঙ্গলে গিয়ে, জঙ্গল থেকে প্রচুর ফল নিয়ে এসেছিলো। সেগুলোই ঝর্নার তোলা জলে ধুয়ে নিয়ে এসে, খেতে দিলো সবাইকে। নিজেও ক'টা ফল খেয়ে নিলো। ফল খাওয়া নিয়ে, ঈরা আর আকরা- নোরার সব থেকে ছোট দুই মেয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিলো। সুসি ঈরাকে, নিজের ফল থেকে কটা ফলের টুকরো দিয়ে ঝগড়া থামালো।পড়ন্ত বিকেলে শুরু হলো মরা মহিষটাকে ছাড়ানোর প্রস্তুতি।

পিচ আর তার পরের ভাই এলিন প্রথমে সূচালো পাথরের সূচালো মুখটা দিয়ে মহিষের পেট কেটে ফেললো, মাঝামাঝি দুই ফাঁকে। তার পরের ভাইরা একে একে, মেটে, হৃদয়, পিত্ত বার করে নিলো। তারপর সব নাড়িভূঁড়িগুলো ফেলে দিয়ে, খাবলা করে করে মাংস ছিঁড়তে লাগলো। সুসি ততক্ষণে, মহিষের শিং দুটো বার করে, সরিয়ে নিয়েছে, একটা নোরার জন্য, একটা

নিজের জন্য। তারপর, লতানে গাছের শাখায় শিং দুটো বেঁধে গলায় পড়ে নিয়েছে। নোরা কেও পরিয়ে দিয়েছে।

সব মাংস বার হতে আঁধার নেমে এলো। ঈরা, একটা গাছের মোটা ডালে, খড় বেঁধে আগুন জ্বেলে আনলো। তারপর সেই আগুনের আলোয় চললো, নাচ- আর চিৎকার। মাংসগুলো পোড়ানো হলো একটা গাছের ডালে বেঁধে। তারপর, নরম মাংস, নৃত্যের ছন্দ আর পচা আঙুরের রসের মাদকতায় রাত বেড়ে চললো। সুসি শুয়ে পড়লো এলিনের সাথে, নোরা শুয়ে পড়লো পিচকে জড়িয়ে। ঈরার সদ্য ওঠা যৌবনের দাপ মেটালো নোরার আরেক ছেলে রিট। আকরা তার পিঠোপিঠি দাদা আকতার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। গুহার দরজায় সারা রাত জ্বলতে লাগলো আগুন। জঙ্গলের ভেতরে বন্য জন্তুর ডাকচলতে থাকলো অবিরাম।

অন্ধকারেই শোনা গেলো পাখির কাকলি। নোরা উঠে পড়লো ঘুম থেকে। অন্যরা তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাল্কা ঠান্ডায় মোটা ভাল্লুকের কালো ছালটা জড়িয়ে নোরা বাইরে এলো। দেখলো, দুটো শেয়াল গতরাতের ফেলে দেওয়া মহিষের হাড়-গোড় চাটছে আর নাড়ি-ভূঁড়িগুলো সাফ করে দিয়েছে। নোরা আগুনটাকে নেড়ে শেয়াল দুটোকে তাড়ালো। তারপর, হাড়গুলো গুছিয়ে জড়ো করে রাখলো, ঝর্নার জলে ধুয়ে আনবে বলে। তারপর সেগুলোর গায়ে ফুটো করে মালা বানাবে ছেলেদের জন্য। দূরে দেখলো, আকাশে লাল রং ধরছে। একটা-দুটো কাক উড়ছে আকাশে।

একটা পুরুষ মানুষ, একমুখ সাদা-বাদামী দাঁড়ি ও লম্বা বাদামী চুলে ভর্তি মুখ নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে নোরাকে। মানুষটা, লম্বায় সাতফুট মতন হবে। হাতে গাছের ডাল। পরনে গাছের ছাল। চোখদুটো হলদেটে,জ্বল জ্বল করে যেন আগুন জ্বলছে দৃষ্টিতে। নোরাও জ্বলন্ত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো মানুষটার দিকে। কিছুক্ষণ পর মানুষটা হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে এসে, ইশারায় বোঝালো- ক্ষিদে পেয়েছে। নোরার চোখ শান্ত হলো। সে, গুহার ভিতরে গিয়ে, দেখলো কিছু খাবার রাখা আছে কিনা।

কয়েকটা ফল আর কয়েক টুকরো বাসি-পোড়া-মহিষের মাংস একটা বড় পাতায় সাজিয়ে এনে পাথরের বড় চাইটাতে রেখে, গুহায় ফিরে এলো। ততক্ষণে, আকাশ ফর্সা হয়েছে। সুসি ঘুম থেকে উঠে পড়লো। নোরা , আবার বাইরে এসে দেখলো, সেই মানুষটা নেই। খাবারের পাতাটাও নেই। মানুষটা , খাবার খেয়ে চলে গেছে। নোরা, পাথরের বড় চাইটার কাছে পেঁপেদানা থেকে বার হওয়া ছোট ছোট গাছগুলো, একটা একটা করে তুলে, একটু একটু দূরে সারি দিয়ে বসিয়ে দিলো। দেখলো, তেঁতুলের বীজের থেকেও বার হয়েছে একটা ছোট গাছ। গুহার ভেতরে, ঝর্ণা থেকে নিয়ে এসে জল, ভরা থাকে একটা জায়গায়। সেই জল একটু হাতে করে এনে দিয়ে দিলো ছোট ছোট গাছগুলোতে। হঠাৎ চোখে পড়লো, পাথরের পাশে পড়ে আছে একটা সাদা পাথরের মালা। কি সুন্দর দেখতে। এটা কার? আশে পাশে কেউ নেই দেখে, নোরা মালাটা গলায় পড়ে নিলো।
সুসি এসে পিছনে দাঁড়ালো। একমুখ হেসে, নোরাকে

বোঝালো, খুব ভালো লাগছে। নোরা, লজ্জা পাওয়া মুখটা .লুকিয়ে ফেললো হাতের তালুতে। রোদের তাপ বাড়তে লাগলো। ছেলে- মেয়ের দল বেরিয়ে এলো গুহার ভিতর থেকে। আড়মোড়া ভেঙে, সবাই শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। সুসি যাবে ফলের যোগাড়ে, পাহাড়ের ওপরের অংশে। সবাই, আঙুরের পচা রস, মড়া জন্তুর ধুয়ে রাখা খুলিগুলোতে, একটু একটু করে নিয়ে, যে যার গলা ভিজিয়ে বেড়িয়ে পড়লো। নোরা লেগে পড়লো পেঁপে গাছগুলোর যত্নে। পাথরের পাশের পাথুরে জমিকে, সে প্রথমে , পাথরের বড়বড় টুকরো দিয়ে ঘিরে ফেললো। তারপর, পাথরের ধারালো এক টুকরো দিয়ে, ওখানকার মাটিটা খুঁড়তে লাগলো। বেশ অনেকটা জায়গা। পেঁপে গাছ ছাড়াও, আরো কিছু গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার প্রস্তুতি করে রাখলো। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সুসি ফিরে এলো। একটা বড় গাছের ছালে, অনেক ফল জড়ো করে নিয়ে এসেছে। নোরা, হলুদ মোটা মোটা দাঁতের সারি বার করে একমুখ হাসলো।

মেয়েটা খারাপ নয়। নোরার সুসির ওপর মায়া জন্মে গেছে অনেকটা। এই মায়া ছেড়ে দুজনে পরে আলাদা হতে পারবে তো! নোরার মনে পড়লো, ঠিক এরকমই একটা গাছের মোটা ছাল পড়েছিলো, আজ, ভোর রাতে দেখা, পুরুষ মানুষটা। কোথায় গেলো সে, কে জানে! কোথা থেকে এসেছে, তাই বা কে জানে! খাবারের বিনিময়ে তার জন্য রেখে গেছে , সুন্দর এই হারটা- নোরা, একবার পাথরের হারটায়,হাত বুলিয়ে নিয়ে, উঠে পড়লো, ঝর্নার দিকে যাওয়ার জন্য। সুসি, ঝর্নায় স্নান সেরে, ফল নিয়ে চলে এসেছে। সঙ্গে এনেছে, কিছু সাদা

মূলা, কিছু গাজর, কিছু মোটা মোটা বেগুন, কিছু মোটা বাদাম ও লেবু। নোরা ঠিক করলো সব সব্জি ও ফল, ও একটু একটু করে নিয়ে, বসিয়ে দেবে ঘেরা জায়গায়। দেখা যাক, ও যা ভাবছে, তা সত্যি কিনা। ওগুলোর থেকে নতুন গাছ বার হয় কিনা। এইসব ভাবতে ভাবতে নোরা এগিয়ে চললো। পরনে, লাল ভালুকের চামড়া আর সাদাপাথরের মালায়, নোরাকে সত্যি ভালো দেখাচ্ছিলো। হঠাৎ, নোরার চোখ আটকে গেলো, পাহাড়ী ঢালের বাঁকে, বড় ম্যাপল গাছটার পিছনে। আজ ভোর রাতে দেখা সেই পুরুষ মানুষটা না? মানুষটা, হাতের ইশারায় নোরাকে ডাকলো। নোরা, মানুষটার কাছে যাবে কিনা ভাবছে, কোথা থেকে একটা বুনো চিতা এসে নোরার সামনে দাঁড়ালো। নোরার কাছে, সুসির দেওয়া মহিষের মোটা শিংটা ছিল গলায় পড়া। সেটা খুলে, ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতার ওপর।দুজনে যখন মরণ-বাচন লড়াই চালাচ্ছে, তখন, মানুষটা, একটা বড় পাথরের খন্ড তুলে,চিতার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো চিতাটার ভবলীলা সাঙ্গ করে। নোরা, মানুষটার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ও চিতাটাকে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়তে দেখে, আনন্দে, হাততালি দিয়ে উঠলো। মানুষটা, হাসি মুখে নোরার সামনে এলো, বিজয় গর্বে। নোরা চোখের সলজ্জ ধন্যবাদে, মানুষটাকে কৃতজ্ঞতা জানালো। মানুষটাকে, এই প্রথম নোরা কাছ থেকে দেখলো।নোরারই সমবয়সী বলে মনে হলো নোরার। লালচে বাদামি রঙের গায়ের রং। চোখ দুটো বড় বড় সুগোল ও বাদামী । পরনে শুধু, বৃক্ষছাল। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া শরীর। পেশীতে পেশীতে শক্তির ছাপ। ঠিক নোরার প্রজাতির নয়। আগে কখনো

দেখেও নি নোরা মানুষটাকে। মানুষটা এগিয়ে এসে- "একওয়া" বলে হাত বাড়িয়ে দিল নোরার দিকে। নোরা, সভয়ে, সেইহাত স্পর্শ করে বললো,-" নোরা" । দুজনের ভাব হয়ে গেলো। দুজনে একসাথে চললো ঝর্নার ধারে। যেতে যেতে নোরা বুঝলো, একওয়া, বিদেশী। পশ্চিম থেকে এসেছে । সে মাছ ধরতে একটা বড় গাছের গুঁড়ি নিয়ে বের হয়েছিলো সমুদ্রে। হঠাৎ, প্রচন্ড ঝড় ওঠে। দিক ভুল হয়ে যায় একওয়ার। চলে আসে নোরাদের দেশে। গাছের গুঁড়ি ভেসে গেছে সমুদ্রের জলে। সে, টানা দুই রাত- দুই দিন সাঁতার কেটে ওঠে নোরাদের দ্বীপে।   দুজনে পৌঁছে যায় ঝর্নায়। দুজনে একসাথে সাঁতার কাটে, মজা করে, মাছ ধরে । একওয়া প্রচুর মাছ, ঝর্না থেকে তুলে, ওর পরনের বৃক্ষ ছালে জড়িয়ে, নিয়ে আসে। নোরা, একওয়াকে, ওদের গুহায় থেকে যেতে নিমন্ত্রণ জানায়। একওয়া রাজি হয়ে যায়।

নোরা আর একওয়া যখন গুহায় ফেরে, তখন মাথার ওপর সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। গুহায় ফিরে নোরা মাছগুলো সুসিকে দিয়ে দেয়, পোড়ানোর জন্য। সুসিকে, নোরা বুঝিয়ে দেয় একওয়া ওদের গুহায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। ওকে খাতির করতে। সুসি, একটা মোটা গন্ডারের চামড়া গুহায় রাখা বড় পাথরের ওপর পেতে দিয়ে, একওয়াকে বসতে বলে । পুরানো পচা আঙুরের রস একটা পশুর খুলিতে করে এনে দেয় পানের জন্য। তারপর, নোরা আর একওয়া গল্প- আলাপচারিতায় মেতে ওঠে।

সুসি, মাছ গুলো ধুয়ে, পোড়াতে নিয়ে যায়। অপরাহ্নের মরা আলোয় নোরার ছেলে -মেয়েরা দল বেঁধে গুহায় ফেরে। নোরা, সবার সাথে একওয়ার আলাপ করিয়ে দেয়।তারপর সবাই একসাথে বসে কিছু ফল আর মাছের পোড়ার টুকরো মুখে দেয় আর গল্প করে। একওয়ার দেশ, পরিবার, দেশবাসীদের কথা, ওদের দেশে সবাই মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়,গাছের গুঁড়ি কেটে নৌকা বানায়, ফল, মাংস, লোহা, গাছের গুঁড়ি দিয়ে ওরা বিনিময় চালিয়ে একে অপরের সাহায্যে জীবনটাকে সহজ করে নেয়। আরো কত কথা। গুহার বাইরে পড়ে থাকে, শিকার করে আনা, প্রচুর তিতির পাখির মাংস। সুসি, সেগুলো ছাড়িয়ে, রাতের খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে যায়।

একওয়া দেখায়, ওর কাছে বেশ কয়েকটি কালো, শক্ত, ধারালো ছুরি আছে। সেগুলোকে, লোহা বলে। লোহার ছুরি, শিকারের জন্য ও মাংস কাটার জন্য দুভাবেই অনেকটাই সহযোগিতা করে। একওয়া, ওদের সবাইকে একটা করে লোহার ছুরি উপহার দিলো। সবাই খুব খুশি হলো লোহা পেয়ে।মুহুর্তে, একওয়া ওদের পরিবারের, অনেকটা আপন হয়ে গেল। রাতে, সবার সাথে নাচ-গান করলো একওয়া। তবে, সব চেয়ে বেশি নৃত্য করলো নোরার সাথে। নোরার কোমর জড়িয়ে, একওয়ার নাচ আর মাঝে মধ্যেই চুমু খাওয়ার ধরন দেখে, সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। একওয়া সবার সাথে মাংস খাওয়ার সময়, একটা লালচে পাথরের টুকরো বার করে, আরেকটা পাথর দিয়ে গুঁড়া করে গুঁড়াটা ছড়িয়ে দিলো পোড়া মাংসের ওপর। সবাই অবাক হয়ে দেখছিলো। তারপর, মাংসের টুকরো মুখে দিয়ে দেখলো-

কি অপূর্ব স্বাদ! অভিনব এই স্বাদে, বিস্মিত হয়ে গেলো সবাই। খাওয়ার পর একওয়া, নোরার সাথে, শোয়ার জন্য, আমন্ত্রিত হলো। রাত কেটে গেলো উদ্দাম আনন্দে।

পরদিন সকালে, একওয়া চলে যেতে চাইলো। কিন্তু, সবাই তাকে এতো ভালোবেসে ফেলেছে যে, কেউ তাকে ছাড়তে রাজি হলো না। একওয়াকে, তারা, তাদের দলের একজন করে নিলো। নোরা, খুশি হয়ে নতুন করে বাঁচার স্বাদ পেলো।

ছেলেদের শিকার করে আনা পশু চামড়াগুলো ধুয়ে ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে, একওয়ার জন্য অনেক পোষাক বানিয়ে দিলো। একওয়া, ওদের সাথে, শিকারে যায়, মাছ ধরে, বড় বড় মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে সমুদ্রে ভাসতে শেখায়, গাছের মোটা গুঁড়ি দিয়ে বসার চেয়ার বানায় সবার জন্য। আর দুটো গুঁড়ি একটা গুড়িতে যোগ করে, লোহার দন্ড দিয়ে শিক কাবাবের ব্যবস্থা করে। রক সল্ট যোগাড় করে খাবারকে সুস্বাদু করতে শেখায়। কাঠের টুকরো, পাথরের টুকরো লোহার ফলাকা দিয়ে গহনা থেকে শুরু করে বল্লম বানাতে শেখায়। বিভিন্ন লোহার কাটারী, কুফরী, এমনকি তরোয়াল পর্যন্ত বানাতে শেখায়। এভাবেই কেটে যায় দিন।

একদিন নোরা দেখে,ওর মুখ থেকে,কাশির সাথে,সমানে রক্ত পড়ছে। ক'দিন পর, এই কাশি আর রক্ত পড়া বাড়তে থাকে। নোরা দুর্বল হতে থাকে। সঙ্গে বেদম জ্বর। গুহার ভেতর থেকে বার হওয়া বন্ধ হয়ে যায় নোরার। একওয়া ওর সেবা যত্ন করে। তাই, আর ছেলেদের সাথে

শিকারে যায় না। শুধু ঝর্ণায় যায় স্নান করতে, মাছ ধরতে। সুসিও নোরার সেবায় রাত-দিন লেগে থাকে। সবাই বুঝতে পারে, নোরা কে আর বেশীদিন পাওয়া যাবে না। নোরা একওয়াকে বলে নিজের দেশে, নিজের লোকের কাছে ফিরে যেতে। একওয়া রাজি হয় না।

একদিন, একওয়া, ঝর্না থেকে মাছ শিকার করে নিয়ে আসছিল, আর নোরার কথা ভাবছিলো, কি করে বাঁচানো যায়! অন্যমনস্ক হয়ে পথ হাঁটছিলো একওয়া। হঠাৎ, মাছের গন্ধে, কাছে এসে, পিছন থেকে এক ভল্লুক, দাঁত বসিয়ে দিলো একওয়ার কাঁধে। আচমকা আক্রমণে, একওয়া তাল সামলাতে না পেরে, পড়ে গেলো। ভল্লুকটা, একওয়াকে, ছিন্ন ভিন্ন করে, টানতে টানতে নিয়ে গেলো গভীর জঙ্গলে। একওয়ার হাতের বল্লম টা পড়ে থাকলো ওখানেই। শিকার করা মাছগুলোও ভল্লুকটা নিয়ে যেতে ভুললো না।   অপেক্ষায় বসে বসে বিকাল হয়ে এলো। দুশ্চিন্তায় নোরার চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসতে লাগলো। নোরার ছেলেরা, ভল্লুক শিকার করে গুহায় ফিরলো। সঙ্গে, একওয়ার বল্লম। নোরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভীষন গর্জনে। তারপর, চিরকালের মতন স্তব্ধ গেলো তার কন্ঠস্বর। ছেলেরা, পেঁপে গাছগুলোর সামনে, নোরার ঘেরা জায়গাতে, মাটি খুঁড়ে, গর্ত করে নোরাকে শুইয়ে দিল। পাশে একওয়ার বল্লম। সুসি আর পিচ, প্রথম মাটি দিলো, নোরার শুয়ে থাকা শরীরে।   রাত ক্রমশঃ গভীর হলো।কারো আর শিকার করে আনা ভল্লুকটাকে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা হলো না। সুসি ছাড়া সবাই শুয়ে পড়ল। সুসি নোরার বসার পাথরটার ওপর ঠায় বসে রইল সারাটা রাত। পরদিন যখন ভোর

হল, ছেলে মেয়েরা এক এক করে উঠে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ল হৈ হৈ করে, নোরার মৃত্যু ওদের মনে এতটুকু ছাপ ফেলেনি বোঝাই গেল। ওরা দূরে মিলিয়ে গেল কলস্বরে। সুসির জলভরা চোখ ওদের যাওয়ার পথের উড়তে থাকা ধূলোর দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষ। আর তখনই ও বুঝতে পারল পিচের ভালোবাসা ওর শরীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।

আগামী

_______ সমুদ্রের ঢেউ আছাড়ি - পিছাড়ি খাচ্ছে তটভূমে। নারিকেল গাছের সারি,মাথা দুলিয়ে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে-" না, না, না, এখনি, এতো তাড়াতাড়ি না। এতো তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদ সহ্য হবে না প্রভু । এখনি না।"

প্রভু ঠোঁটের কোণে, স্মিত হাসি টেনে, আপন মনে বললেন,-"কোথায় আর যাচ্ছি? আমি যে আমার সৃষ্টির মধ্যেই বাঁধা। তোমাদের সাথে আমি মিশে থাকি ভিন্ন ভিন্ন রূপে-এই যা। আবার, আমি নতুন পরিচয়ে, নতুন রূপে আসবো তোমাদের সাথে খেলা করতে। এখন, একটু বিশ্রাম চাই। ওই দেখো, আমার রাধারাণী এসেছে, আমায় নিয়ে যেতে। আনন্দ লোকে, আমি এবার, আমার রাধার সাথে মনের সুখে রাসলীলা করবো। দ্বারকেশ্বর রাজ এবার বিদায় চাইছে তোমাদের কাছে। বিদায় দাও তোমরা। একি! প্রবল বর্ষনে তোমরা কাঁদতে শুরু করেছো ? বললাম তো, আবার আসবো আমি। কথা দিলাম।" শ্রী দ্বারকেশ্বর নাথ বিশ্রামের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। সংবাদটা, পঞ্চ পান্ডবদের কানে পৌঁছে গেলো। সবাই এলো শেষ বিদায়ের শেষ দেখার জন্য। রুক্মিণী সহ অন্যান্য কৃষ্ণবিবাহিতা নারীরা চললেন সতী দাহে, কৃষ্ণের সাথে আর, সত্যভামা গভীর অরণ্যে,

গেলেন কৃষ্ণ নাম জপে, কৃষ্ণ কথা বিশ্বকে জানিয়ে সন্ন্যাসীনির জীবণ যাপনে। অর্জুন কৃষ্ণের দাহ কার্য করে কৃষ্ণের হৃদয় ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রের জলে।

তারপর, সেই হৃদয়, ভাসতে ভাসতে সময়ান্তরে এসে পৌঁছালো উৎকল রাজ্যে। প্রতিষ্ঠিত হলো মন্দিরে। লক্ষ্মী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা হলেন রুক্মিণী, মা বিমলা নামে। এ ঘটনা আমরা সবাই জানি। কাকভোরের কালো চাদরে ঢাকা প্রকৃতি ও সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে বসে, কৃষ্ণকায় সত্ত্বা অন্যমনস্ক হয়ে, চিন্তায় বিভোর। -" কি হলো নাথ! প্রাতঃভ্রমণের আনন্দ কোথায়? এতো দুশ্চিন্তা কিসের ? পাশেই তো তোমার বিমলা উপস্থিত তোমার সেবায়। তবে ?"

-" না বিমলা, আর চুপ করে বসে সেবা নিয়ে চলা বোধহয় যাবে না। সেবা নেওয়ার দিন শেষ। এবার কর্মের পালা। আবার বোধহয়, কর্মের জন্য অবতার রূপে আমাদের প্রকাশিত হওয়ার সময় এসেছে। "

-" কি বলছেন নাথ! এতো তাড়াতাড়ি! আবার আমাদের বিচ্ছেদের দিনএসে গেলো প্রভু !"

-"না, বিমলা, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এবার আমরা হবো না। এই মন্দিরে থাকবো দুজনে। কিন্তু, আমাদের শক্তির একটু করে অংশ যাবে কর্মের কারণে,মানব রূপ ধরতে। তুমিও তোমার অংশকে পাঠাবে প্রিয়া, আমিও। "

-" এই জন্মে, আমরা একসাথে কাটাবো তো, পুরো জীবনটাই ? বিচ্ছেদের বিরহ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হবে না তো ? "

-" গত জীবনেও তো আজীবন একসাথে কাটিয়েছি আমরা। তোমাকেই তো বিবাহ করে স্ত্রী এর মর্যাদা দিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর তুমি সহমরনে এলে, মনে নেই ?"

-" তা দিয়েছেন। তবে, গত জীবনে, আপনি রাধাকেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। রাধা নাম জপ করেই কাটালেন। আমি শুধু আপনার সহধর্মিনী হয়েছিলাম মাত্র।"

-"কেন,যুগে যুগে তুমিই তো ছিলে আমার সহধর্মিনী। ত্রেতা যুগেছিলে সীতা রূপে, তার ও আগে, বেদবতী রূপে, তুমি তো আমাকেই মন দিয়েছিলে। রাবনের কারনে আমাদের মিলন হয় নি। তোমার অভিশাপেই তো, পরজন্মে, রাবন তোমার কারনে, আমার হাতে বধ হলো, আর সেই জন্যে আমাদের বিবাহ মিলন হয়েছিল। হ্যাঁ, একথা সত্য, কোন অবতারেই আমরা পুরো জীবন একসাথে মিলিত থাকতে পারিনি- তুমি তো জানো, সে মহর্ষির অভিশাপে।"

-" জানি প্রভু। তাই তো আপনাকে পাওয়ার অতৃপ্তি আমাকে কাঁদিয়েছে বারবার। রাধার ওপর হিংসা আমার সেই অতৃপ্তি থেকেই। এই অতৃপ্তি, আমাদের বারবার অবতার জন্মে টেনে নিয়ে যায়। আবার অবতার জন্মে অর্থাৎ আবার বিচ্ছেদের বেদনা ও অতৃপ্তি।"

-" বিমলা, তুমি জানো, রাধা কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নয়, আমারই,হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন এক অংশ। ত্রেতা যুগে, যাকে আমি, তোমার অভাবে, রাজসূয় যজ্ঞে, পাশে বসানোর জন্য তৈরী করেছিলাম, সেই মায়া সীতাকে,

অকালে বিসর্জন দিয়েছিলাম আবার তোমাকে ফিরে পেয়ে।সেই মায়া সীতা তো আমারই সৃষ্টি ,আমারই হৃদয়াংশ, আমারই হৃদয় আবেগ। তার কোন জয়প্রচার হলো না, এ তো সেই মায়া সীতার প্রতি অন্যায়। তাই, দ্বাপরে, সেই মায়া সীতারূপে রাধা রানীর জন্ম হয়েছিল আমার সাথে, আমারই পাশে প্রচার ও প্রণাম পাওয়ার জন্য। রাধা-কৃষ্ণ আসলে এক সাথে পূর্ণ নারায়নেরই রূপ - যুগল মূর্তিতে বিভক্ত আমার পূর্ণ সত্ত্বার মূর্তি। আমার, এই রূপের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমার জীবন, রাধাময় ছিল। তারপর, ভেঙ্কটেশ রূপে আমি তো তোমার মূর্তি কে পাশে বসিয়ে, পূজার প্রচার করেছিলাম। মনে করো, পদ্মাবতী নামে তুমিই তো আমার বিবাহিতা স্ত্রীএর মর্যাদা পেয়েছিলে। আমি তোমাকে ভালোবেসে, তোমাকে বিবাহ করার প্রার্থনা, তোমার পিতা, আকাশের কাছে রেখেছিলাম, নিজে। তবু, এখনো তোমার রাধা রূপের প্রতি এতো অভিমান প্রিয়া ?"

-" হুঁ, তার সাথে আপনি কিছুদিন পর, ভূদেবীকেও, আপনার আরেক পার্শ্বে স্থান দিলেন। মনে আছে ?”

-" আমি প্রতি জন্মেই, তোমাকেই খুঁজে নিয়ে বিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছি। শ্রীনিবাস রূপে আমি তোমাকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলাম ভার্গবী। মনে করো।"

-" আমি সবই জানি নাথ। তবু, আপনার, মন দেখছিলাম। এজন্মেও কি তবে, আপনার আমার একত্র মিলন হবে, বিবাহ স্বীকৃতি হবে ?"

-" না, বিমলা। মিলন হবে, তবে, বিবাহ হবে কিনা এখনি বলতে পারছিনা। কারন,এ যুগে, বিবাহের কোন মূল্য - মর্যাদা থাকবে কিনা দেখতে পাচ্ছি না। তবে, আমরা দুজনেই একসাথে কাটাবো আমাদের জীবন- কথা দিচ্ছি প্রিয়া- এবার মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নাও, নতুন জীবনের নতুন লীলার জন্য। "

-" আপনার উত্তর,আমাকে বিষন্ন ও চিন্তিত করে দিলো প্রভু। "

-" দেখো, সূর্য দেবের প্রকাশে পৃথিবী জেগে উঠছে। এখনি, চলো মন্দিরে। মন্দিরে ভক্ত বৃন্দ আসতে শুরু করেছে। "

-" হ্যাঁ, চলুন প্রভু।"

কেটে গেলো আরো বেশ কিছু বছর, সময়, কাল।

-" কি দিন আসলো বলোতো ভাই ? চারিদিকে মৃত্যু ও ধ্বংস। নিউজ বুলেটিনে একটাও ভালো খবর শুনতে পাচ্ছো?"

-" না ভাই, এখন আমি আর খবরের কাগজ পড়িনা। ছেলেটা বিদেশে থাকে। ভয়ে সবসময় আধমরা হয়ে থাকি ছেলের জন্য"।

-"যা বলেছো। এখন আবার, নিজের জন্মভূমিতেও শান্তি তে থাকা যাচ্ছে না। আসলে, বুঝলে, কালের নিয়মে কলির দাপটে চলছে পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। শিক্ষার মূল্য আর নেই। টাকার অঙ্কে হারিয়ে গেছে মনুষ্যত্ব ও বিবেক। একসময়, আমার ঠাকুর্দা যে বিদেশী শাসনের হাত থেকে দেশকে

বাঁচাতে প্রাণ দিলেন, আজ, আন্তর্জাতিকতার নামে, আমরা সেই বিদেশি তোষনেই জীবন কাটাচ্ছি। কি লাভ হলো স্বাধীনতা পাওয়ার লড়াইয়ের? আমার ছেলে তো বিদেশি কোম্পানিতেই ইঞ্জিনিয়ার। ওদের হয়েই কাজ করে। আপনার ছেলের মতো বিদেশে না থাকলেও, এদেশে থেকে বিদেশের গোলামীই করে তো। "

-" সেই, ঠিকই বলেছো। আজ আমরা হয়ে গেছি বৃদ্ধ, বাতিলের দলে।আমাদের কথা কে শোনে !"

-" আর, চাকরী বাকরীর যা জমানা পড়েছে! এ ছাড়া ওরাই বা কি করবে! স্বাধীন ব্যবসা করে জীবন কাটানোর সাহস কি আর বাঙালিদের আছে ? বাঙালি চিরকাল অন্যের কথায় কাজ করে জীবন কাটিয়েছে। খুব কম বাঙালি আছে, যারা সাহস করে নিজের বুদ্ধিকে ভরসা করে, নিজের মতে কাজ করে, নিজের জীবনকে নিজের মতো চালিয়েছেন। চাকর গিরি করে, মানে চাকরী করেই তো আমাদের জীবনও কাটলো। আপনি রাজ্য সরকারী আর আমি কেন্দ্র সরকারী। তফাৎ শুধু এটুকুই। আমরা দুজনেই চাকর, তবে, সরকারের। আমরা আমাদের দেশের জন্য, দেশের অধীনে, দেশের চাকর গিরি করেছি। এটাই আমাদের গর্ব।"

-" দেখে এসো ভায়া । সামনেই নর্দমা। মাঠের পাশে এই খোলা নর্দমা রাখা উচিৎ নয়। একটা ঢাকনা করে দিতে পারে। "

-" যাই বলো, সকালে, মাঠে একঘন্টা হেঁটে, বেশ ক্ষিধে ক্ষিধে পেয়ে যায়। চলো, একটু চা খেয়ে ঘরে ফিরি।"
-" হ্যাঁ, চলো চা খাওয়া যাক।"

-" এই পরেশ, দুটো চা দে।"   বিহারীলাল শূর ও রামকুমার সর্দারের বন্ধুত্ব এভাবেই শুরু হয়েছিল,সকালের প্রাতঃভ্রমণের সময়, এই পালদের মাঠে, তা, প্রায় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। তখন সবে নতুন বাড়ি বানিয়ে এসেছিলেন শূর বাবু। সর্দারদের আস্তানা তারো আগের থেকে। এভাবেই তাঁরা আজো, রোজ মাঠে, ভোরবেলা হাঁটেন, দেখা করে, গল্প করে, ফেরার সময় চা খান পরেশের দোকান থেকে। তারপর, যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা লাগান।

সেদিন শূর বাবু, বাড়ি ফিরতেই, স্ত্রী বাজারের ব্যাগ এগিয়ে দিলো।

-" মেয়ে জামাই আসছে। যাও ,বাজার থেকে মাটন, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো,আলু নিয়ে এসো। আর দই- মিষ্টি আনবে। "

-" আজ অফিসের দিনে মেয়ে জামাই আসছে! সব ঠিক আছে তো ?"

-" সন্ধ্যা বেলায় আসবে। রাত্রে খেয়ে যাবে। তন্দুরী নান্ রুটি আর মাটন কষা বানাবো। সঙ্গে স্যালাড। চাটনি, মিষ্টি তো থাকবেই।"

-" তাহলে, দই কি হবে! "

-" আসলে একটু লস্যি করে দেবো। চা তো জামাই খায় না। তাই।"

বিকেলে, হই হই করে, আড্ডা জমে উঠলো, মেয়ে, জামাই আর নাতনির সঙ্গে।নাতনি তিয়াস এসেছে বাবা-মা এর সাথে। দিদিভাই কত বড় হয়ে গেছে! দেখতে

দেখতে উনিশ বছরের হয়ে গেল। ফর্সা, স্লিম লম্বা মেয়েটা যেন সাক্ষাৎ উর্বশী। টানা টানা চোখ, পাতলা ঠোঁটে গোলাপী আভায় তিলোত্তমা। দেখতে দেখতে চোখ ভরে এলো জলে শূর বাবুর। এবার সেই আদরের ছোট্ট নাতনিকে,পরের ঘরে পাঠানোর সময় এসেছে। হারিয়ে যাবে দিদিভাইএর সেই আদো আদো সুরে বায়না করে আইসক্রিম চাওয়া, পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আবদার। গল্পের ফাঁকে এইসবই ভাবছিলেন শূর বাবু।

-" ও বাবা, জানো তো, একটা সমস্যায় পড়েছি। সমাধান করেদাও।"

মেয়ের কথায় হুঁশ ফিরল শূর বাবুর।

-" কি সমস্যা রে ? তোর আবার সমস্যা কি হল ?" শূর বাবু অবাক হলেন।

-" তিয়াস তো খুব ভালো গান করে। ফ্রান্সে, একটা গানের প্রতিযোগিতা হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে। ইউরো ভিশন সং কনটেস্ট নামে। তিয়াস কে, ওখানে অংশ নিতে ডাকা হয়েছে। কালই, তার মেল পেয়েছে তিয়াস। আর, কালই, তোমার জামাইএর অফিসের এক ভদ্রলোক, তিয়াসের সাথে নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ছেলেটা খুব ভালো। নাসায় কর্মরত বিজ্ঞানী। ছেলেটা নাসা থেকে আসছে, এই বিয়ের ব্যাপারে তিয়াস কে দেখতে। কি করি বলো তো? তিয়াস জেদ ধরেছে ফ্রান্সে যাবে। ও গেলে আমরাও যাবো। কিন্তু, তাহলে, এতো ভালো সম্বন্ধটা হাত থেকে বের হয়ে যাবে যে !"

-" না, তিয়াস এখন বড় হয়েছে। ওর ইচ্ছাকে মর্যাদা দে। নয়তো, তোদের ওপর ওর অভিযোগ অভিমান, সারা জীবন থেকে যাবে। তাছাড়া, এখন, আগে কেরিয়ার। তারপর বিয়ে।যদি, ভাগ্যে এই সম্বন্ধ লেখা থাকে, তো পরেও হবে। তুই যা, বরং, ওই ভদ্রলোক মানে, পাত্রের বাবাকে সব বুঝিয়ে বল। দ্যাখ, ওরা তিয়াসের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি কিনা। তবেই বুঝবি, সম্বন্ধটা পরেও পাকাপাকি হবে। এখন তিয়াস কে, ফ্রান্সে যেতে দে।"

-" দাদুন, ইউ আর গ্রেট!" বলে, দিদিভাই, সেই ছোট্ট বেলার মতো গলা জড়িয়ে ধরলো, যেমন, ছোটবেলায়, লজেন্স, ক্যাডবেরি পেলে করতো।

-" দিদিভাই, তুই আমার জন্য প্লেনে পাওয়া ক্যাডবেরি আনবি তো?" এবার শূর বাবু বায়না ধরলেন।

-" আনবো দাদু, আনবো। আর সেই সাথে , আমি যদি এই কম্পিটিশনে জিতি তো, আমার জয় আমি, তোমার নামে উৎসর্গ করবো। কথা দিলাম।"

-" তোমার না হাই সুগার! আবার ক্যাডবেরি খাবে!" শূর গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন।

-" ওই দ্যাখ দিদিভাই, হিং লেগেছে। হিংসায় কোথায় যেন আগুন লেগে গেছে।" তিয়াস চেঁচিয়ে উঠলো-"দমকল ,দমকল।"

সবাই একসাথে হেসে উঠলো। রোজকার রূটিন চলে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে মেয়ের ফোন আসে। সকালে,পার্কে যাওয়া, সর্দারের সাথে গল্প- আড্ডা,

পরেশের দোকানে চা খাওয়া, রোজ বাড়ি ফিরে, বাজারে যাওয়া, খবরের কাগজ নিয়ে পড়া, ছাত্র পড়ানো, সন্ধ্যায়, স্ত্রীএর সাথে হাঁটতে যাওয়া, টেলিভিশনের খবর দেখা এভাবেই কেটে যায় কয়েকটি দিন।

নাতনিটা ফ্রান্সে চলে গেছে। খুব চিন্তা হয় শূর বাবুর। মুখে কিছু বলেন না। স্ত্রীও মনেহয়, ওর জন্য দুশ্চিন্তায় আছে। ভালো ভাবে আজকাল কথা বলেন না। মেয়ে ফোন করে নাতনির খবর দেয়।

গিন্নিকে বললেন একদিন শূরবাবু -"তিয়াসের খবর কিছু পেলে ?"

গিন্নি জানালো--"শুনলাম মিষ্টি মেয়ে তো, ওখানে গিয়ে বেশ কিছু বিদেশী বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছে। ছেলে, মেয়ে দুরকম বন্ধুতেই আনন্দে আছে। "

-" কবে ফিরবে ?"

-" তা, একমাস পর। এদিকে তো শুনেছি, নাসার সেই পাত্রটা, তিয়াসের ছবি দেখে, এতো পছন্দ হয়ে গেছে যে, তিয়াসের জন্য অপেক্ষা করবে বলেছে। মেয়েটা শুধু ফিরলেই হয়।"

-" হ্যাঁ, আমারও তাহলে, নাতজামাই দেখা হয়ে যাবে। যাই, আমি স্নান সেরে নিই।"

দুদিন পর –

-" ওগো শুনছো, আমাদের তিয়াস তো দারুন গান করছে প্রতিযোগিতায়। সবাই খুব প্রশংসা করছে।

শুনলাম, ফ্রান্সে, নাকি, ওর অনেক ভক্ত হয়ে গেছে গানের।"

-" কি গান করছে?" শূর বাবু খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

-" আরে, ওদের দেশে গাইছে। ইংরেজি গানই হবে নিশ্চয়ই।"গিন্নি, গম্ভীর চালে উত্তর দিল।

পরদিন, বিকালে,চা খেতে খেতে জিগ্গেস করলেন,-"কবে দেশে ফিরবে তিয়াস দিদিভাই?"

গিন্নি মুখ কালো করে বললো, --" কি জানি! আর কতদিন যে লাগবে প্রতিযোগিতা শেষ হতে কে জানে! এদিকে, প্রতিযোগিতার ফাঁকে ফাঁকে, ওই দেশে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। সেই বেড়ানোর সব ছবিও পাঠাচ্ছে মা কে। তোমার মেয়ে, সেসব ছবি আমাকেও পাঠিয়েছে দেখতে। তোমাকে দেখাবো। দাঁড়াও, নিয়ে আসি। " বলে গিন্নি উঠে দাঁড়ালেন।

একটু পরে, যখন শূর বাবু, কাপের চাএ, শেষ চুমুক দিচ্ছেন, তখন হন্তদন্ত হয়ে উনি, এসে বসে পড়লেন সোফায়, শূর বাবুর পাশে। তারপর, বার করলেন, মোবাইল, যেখানে ছবি লোড করা আছে।

-" এই দ্যাখো, এটা, প্যারিস- সিটি অফ লাইট। এটা, আইফেল টাওয়ারএর নীচে তোলা, এটা নটারডামে তোলা। এটা প্যালেস অফ মার্সেলের, এটা লয়েরী ভ্যালি- কি সুন্দর দ্যাখো! এটা একটা মিউজিয়াম। কি যেন নামটা বললো !" গিন্নির শব্দ উচ্চারণের অক্ষমতার

সাথে সাথে অকারন অহঙ্কার প্রকাশ করতে দেখে হাসি চাপতে পারলেন না শূর বাবু।

বললেন " ওটা লাভরে মিউজিয়াম বোধহয়। আর, লরিভ্যিলি, রিভিয়েরা এসব ঘোরেনি এখনো"?

-" ঘুরবে হয়তো। এখনো তো ফিরতে দেরি আছে। আচ্ছা, তুমি ভালো করে ছবি গুলো দ্যাখো, কিছু নজরে পড়ছে ?"

-" কি ? দারুন জায়গা গুলো ? ছবিগুলো খুব সুন্দর।"

-" আরে না না। ছবিগুলো তো সুন্দর আর দারুন জায়গা এতো ঠিক আছে।কিন্তু, লক্ষ্য করো, এইযে ছেলেটা সব সময় তিয়াসের পাশে দাঁড়িয়ে, তিয়াসের কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলেছে। কি ব্যাপার বলো তো? "

-" কি আবার ? হয়তো বন্ধু হয়ে গেছে।"

-"বন্ধুত্ব একটা লিমিটে থাকলেই তো হয়। তাছাড়া এ নিয়ে,আমাদের নাসার জামাই যদি সন্দেহ করে!"

-" আরে, নাসার জামাই তোমাদের মতন ঘরে বসে সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ জীবন কাটায় না। অত, বসে বসে ভাবার ও কুটকাচালি করারও সময় নেই ওদের।"

-" তাই যেন হয়।"

-" ফালতু চিন্তা না করে, আমায় ছবিগুলো পাস্ করো আমার মোবাইলে। আমি কাল সকালের পার্কে, মর্নিং ওয়াক ও আড্ডায়, ডাট মেরে দ্যাখাবো।"

-" হ্যাঁ এই দিচ্ছি। অবশ্যই দেখাবে সবাই কে। "

পরদিন সকালে, পার্কে, মর্নিং ওয়াক সেরে, জমিয়ে আড্ডা হলো। ছবিগুলো দেখিয়ে তিয়াসের জন্য, গর্বে হৃদয় ভরে উঠলো শূর বাবুর। সবাই স্বীকার করলো, যে, ওরা সবাই কম্পিটিশনের প্রোগ্রামটা ওয়ার্ল্ড টিভিতে দেখছে । তিয়াস ভারতের গর্ব হয়ে খুব নাম করছে। তবে, বারবার হেরে যাচ্ছে একটা ছেলের কাছে। সেটাই নাকি এই ছেলেটা। এবার, শূর বাবুর একটু কপাল কুঁচকে উঠলো চিন্তায়। যাইহোক, তিয়াসের সাফল্যের জন্য সবাইকে আজ, পরেশের দোকানে চা খাওয়াতে হবে। তাই, সবাই মিলে পার্ক থেকে বের হলেন।

-" ওগো শুনছো, আমি তিয়াসের প্রোগ্রাম টা টিভিতে দেখলাম আজ ভোর ছয়টায়। " পার্ক থেকে ফিরতেই গিন্নির উল্লাস চিৎকার।

-" তুমি সাতসকালে টিভি দেখছিলে বসে বসে !"

-" তা আর কি করবো! সারা জীবন তো সংসারের জোয়াল টেনেই গেলাম। আমার নিজের একটু সখ-আহ্লাদ নেই ? পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস আয়ার বলছিলেন, ভোর ছয়টায়, ওয়ার্ল্ড টিভিতে দেখাচ্ছে। তাই দেখলাম খুলে, দেখতে পাই কিনা।"

-" আমাকে বাদ দিয়েই দেখলে !"

-" তুমি কাল দেখো। জানো ওই যে ছেলেটা, তার নাম আমি জেনে গেছি। জিন ব্যাটন। সবাই ব্যাটন বলেই ডাকছিলো। যতদূর মনে হলো প্যারিসের বাসিন্দা। "

-" পারো বটে তুমি জাসুসি করতে।" বলে, শূর বাবু হাতমুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। সন্ধ্যা বেলায়, সবে

টেলিভিশন চ্যানেল খুলে বসেছেন শূর বাবু, হঠাৎ, মোবাইলটা, বেজে উঠলো। একটা অজানা নম্বর। আজকাল খুব হ্যাকিং হচ্ছে, তাই, ধরবো কি ধরবো না করে, ফোনটা ধরলেন তিনি।-" হ্যালো"

-" হ্যালো ডিয়ার, বলো তো আমি কে ?"

-" তিয়াস দিদি! "আনন্দে শূর বাবুর গলা ভেঙে গেলো। ওপাশ থেকে হাসির একরাশ জলতরঙ্গ ভেসে এলো।

-" কেমন আছো তোমরা ?"

-" আমরা তো ভালোই আছি। দিদিভাই, তুমি কেমন আছো ? খুব বেড়াচ্ছো দেখলাম। হ্যাঁ, খুব ভালো গান করছো। এখনে সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর দেখলাম, খুব বন্ধু জুটিয়েছো। এদিকে তো, নাসা বাবু তোমার বিরহে রোগা হয়ে যাচ্ছে।"

আবার খিলখিল হাসি। -" আমার তাতে কি করার আছে ? আমি ওসব নাসিকা, কর্ণের সাথ্ দিতে পারবো না। আমার পছন্দ আলাদা। খুব শিগগিরই ফিরছি কোলকাতা। সঙ্গে এখানকার এক বন্ধু যাবে। ও কোনদিন কোলকাতা দেখে নি। খুব ইচ্ছে কোলকাতা দেখার। ভাবছি, তোমার কাছে ভিড়িয়ে দেবো। দিম্মার হাতের চিংড়ির মালাইকারিটা একটু চেখে দেখুক। রেডি থেকো তোমরা, নিউ ফ্রেঞ্চ ফ্রেন্ডশিপের জন্য। ও কে? এখন রাখছি তাহলে, বাই।"

লাইনটা কেটে গেলো । শূর বাবু কিছু বোঝার আগেই লাইনটা কেটে গেলো। উনার মনের মধ্যে একরাশ কথা

আর প্রশ্ন যেন দলা পাকিয়ে আটকে থাকলো ভবিষ্যতের জন্য।

-" কে ফোন করেছিলো ? কার সাথে কথা বলছিলে ? " জিগ্গেস করতে করতে ঘরে ঢুকলেন গিন্নি।

বিকালের আড্ডা সেরে, টুকিটাকি দোকান করে এইমাত্র ঘরে ঢুকলেন।

-" তিয়াস দিদিভাই ফোন করেছিলো।"

-"কে ? তিয়াস? ইস্, আমার সাথে কথা হলো না! কি বললো? আমাকে বলো সব। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।"

-" বেশি কথা তো হলো না। বল্লো, খুব শীঘ্রই ফিরবে।ওর এক বন্ধু আসবে ওর সাথে। তাকে কোলকাতা দেখাবে। আমাদের কাছে রাখবে, তোমার হাতের চিংড়ির মালাইকারি খাওয়াবে.....এইসব বল্লো।"

-" কে বন্ধু ? সেই ছেলেটা নাকি, যে সব ছবিতে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে ? আসুক বাঁদরটা।"

-" আহা! তুমি আগে থেকেই এরকম করছো কেন? তিয়াসের সম্মানটাও তো দেখতে হবে। তুমি বরং, ওরা আসলে, মেয়ে জামাই এর ঘরটা ওর থাকার জন্য সাজিয়ে রেখো।"

গিন্নি গটমট করে, ঘরের ভিতরে চলে গেলেন, বিরক্তি নিয়ে। একটু পরেই,ফোন নিয়ে বসে গেলেন মেয়ের সাথে কথা বলতে। রাত আটটা, হঠাৎ ছেলের ফোন

এলো আমেরিকার ওহিও থেকে। -" বাবা,কেমন আছো? মা কেমন আছে? "

-" আছি বাবা একরকম। তোমরা কেমন আছো ? বৌমা কেমন আছে? আর দাদুভাই? "

-" আমরা সবাই ভালো আছি। একটু ল্যাপটপটা খোল, তোমাদের দেখি।অনেক দিন হলো দেখিনি। ল্যাপটপেই গল্প করি।"

-" হ্যাঁ, এই খুলছি।" বলে শূর বাবু হাঁক মারলেন -" ওগো শুনছো, কি করছো ? একবার এদিকে এসো। বাবু ফোন করেছে। কথা বলবে।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরে ঢুকে এলো গিন্নি। হাতে গরম খুন্তি। -" মা, কি করছিলে ? কেমন আছো ?"

-" এই রাতের খাবার বানাচ্ছিলাম বাবা। তোরা সবাই কেমন আছিস ? কবে আসবি বাবা ?" বলেই কাঁদতে শুরু করে দিলেন গিন্নি।

-" কাঁদছো কেন ? আমরা ভাবছিলাম এবারের দূর্গাপূজায় কোলকাতা যাবো। অনেক দিন কোলকাতার দূর্গাপূজা দেখিনি। সেই যে বিসর্জনের আনন্দ !"

-" আরে, মা এর আগমন হলো না, অঞ্জলী হলো না, পূজা- আরতি হলো না, প্রথমেই বিসর্জনের কথা বলছো?" বৌমা চেঁচিয়ে উঠলো।

-" আর মা, ধুনুচি নাচ, ঢাকের কাঠি- এসব বলছো না ? " পাশ থেকে একমাত্র আদরের নাতি বিয়াস বলে উঠলো।

-" আরে বুঝছিস না। বিসর্জনের কথা বললাম, কারন, তারপরেই, বিজয়ার মিষ্টি মুখ, লক্ষ্মী পূজার নাড়ু এসব এসে দাঁড়ায় ।তাই না বাবা, বলো ?"

সবাই একসাথে হেসে উঠলো।

-" ঠাম্মি, এবার আমাকে একটু স্পেশাল খাতির করবে। একটা গুড নিউজ আছে। আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম এবার। দাদাই এর স্বপ্ন পূরণ করলাম।" নাতির গর্ব ভরা ঘোষনায় ভরে উঠলো শূর বাবুর মনটা।

-" হ্যাঁ মা, বাবা, আপনাদের এই সংবাদটা জানানোর জন্যই ফোন করলাম আজ। বিয়াস, আজই অ্যাডমিশন নিয়ে এলো।"

-" মানুষের কাছে দেবদূত হয়ে, মানুষের পাশে দাঁড়াও ভাই। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। শুনে ,গর্বে মনটা ভরে গেলো বাবু। "

-" এটা তোমার জীবনের পথ চলার শুরু। এখনো অনেকটা পথ সাবধানে নিজেকে ধরে রেখে, লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে বিয়াস দাদু। তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, তুমি পারবে। মানুষের সব দুঃখ, কান্না মুছে দিয়ে মানুষের পাশে তুমি দেবদূত হয়ে দাঁড়াতে নিশ্চয়ই পারবে সোনা- আমাদের দুজনের প্রাণভরা আশীর্বাদ ও ভালোবাসা উজাড় করে দিলাম তোমায়।"

"শুধু আশীর্বাদ নয়, পূজা উপলক্ষ্যে ভালো ভালো বাঙালী ডিশও খাওয়াতে হবে। "

-" অনেক কথা হয়েছে। এবার আমায় বলতে দে। বাবা-মা, আমরা মহালয়ার দিন পৌঁছাবো ।বলে রাখলাম। আর, দিদিদের খবর কি ? তিয়াস কে তো দেখি টিভিতে। খুব ভালো গান করছে। আমাদের গর্ব। খুব ভালো লাগে।"

-" হ্যাঁ মা, তুমি দ্যাখো ? দেখবে। দারুন জমিয়ে দিচ্ছে তিয়াস। সেদিনের ছোট্ট তিয়াস, আজ কত নাম করে ফেলেছে! সত্যি গর্ব হয়।"

-" ওয়াও, দি,- জাস্ট অ্যামেজিং। আর ওই ছেলেটাও জিন ব্যাটন -ওয়াও, কি দেখতে! কি রঙ্, সোনালী চুল। বাদামী চোখ। আর কি গাইছে! কেউ পারছে না টক্কর দিতে! " এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলো বিয়াস।

-" হ্যাঁ বৌমা, আমি দেখি প্রোগ্রাম। তোদের বাবা পার্কে যায়, ওর দেখা হয় না। আমি সেই সময়, নির্ঝঞ্ঝাটে দেখে নি। তবে, তিয়াস এইমাত্র ফোন করেছিলো। ওদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে এসেছে। এবার খুব শীঘ্রই কোলকাতা ফিরবে। সঙ্গে আবার ওই ব্যাটনটাকে আনবে কোলকাতা দেখাতে।" গিন্নি গলায় সুর ঢেলে বলে ফেললেন।

-" তাই নাকি ?" বাবু আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

-" এর মধ্যে এতো ভাব হয়ে গেছে দুজনের?" বৌমার গলায় কিছু একটা ইঙ্গিত।

-" এদিকে তো শুনেছি, তিয়াসের বিয়ে ঠিক করছে জামাই, নাসার এক বিজ্ঞানীর সাথে। "

-" তাই নাকি, তাহলে তো অনেক গল্প জমে আছে মা। গিয়ে শুনতেহবে।"

-" ইস্, আমি দেরী করে যাবো, জিন ব্যাটনের সাথে আলাপ করাটা মিস্হয়ে যাবে, অটোগ্রাফও নেওয়া হবে না। ধুর !"

-" দাদুভাই, আমি ল্যাপটপের মাধ্যমে তোমার সাথে ওর আলাপ করিয়ে দেবো। চিন্তা করো না।"

-" এখন রাখি বাবা। আবার পরে কথা হবে। চলো বাই।"

ল্যাপটপ অন্ধকার হয়ে গেলো। শূরবাবু ও শূরগিন্নি বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন বন্ধ ল্যাপটপের সামনে। তারপর, শূর গিন্নি চোখ মুছে উঠে পড়লেন ।

-" যাই, রান্নাটা সেরে ফেলি।"

-" কি এমন রান্না করবে ? একটা তো স্যূপ বানাবে শুধু। দুটো রুটিতো বিন্দিয়া বানিয়ে গেছে। গরম করে নিলেই হলো। "

-" হ্যাঁ, ওই আর কি। সেরে ফেলি। তুমি টিভি দ্যাখো, আমি এই সব সেরে, ডিনার রেডি করে, ডিনার টেবিলে ডাকবো, এসো। "

বলে গিন্নি চলে গেলেন। শূর বাবু আবার টেলিভিশনের পর্দায় মন দিলেন। শূর বাবু, পরের দিন সকালে, মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে, ছেলে-বৌমা নাতি আর তিয়াস দিদিভাইএর আসার সুখবরটা জানালেন সবাইকে। সবাই খুব আনন্দ করলো। ব্যাটনের আসার কথাটা চেপে গেলেন ইচ্ছে করেই। দুপুরে, খেতে বসে গিন্নিকে

জানালেন, -"এবারের জন্মাষ্টমী ভালো করে করতে হবে। ওই সময়েই তো তিয়াসরা আসছে।"

-" হ্যাঁ গো। তবে, জন্মাষ্টমীর খাটুনি আর বিদেশী অতিথি সামলানো- দুটো একসাথে আমার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। ভাবছি, মেয়ে জামাইকেও এসে থাকতে বলবো। তাহলে, তিয়াসও থাকবে ওর বন্ধুর সাথে। আমাদের ঝক্কি কম হবে। "

-" কোথায় অতজনকে ঘর দেবে ?”

-" কেন ? মেয়ে জামাই এর ঘরে মেয়ে জামাই থাকবে, গেস্ট রুমে ব্যাটন বাবু থাকবেন, আমাদের ঘরে তিয়াস দিদিভাই থাকবে। "

-" আর আমরা ? "

-" আমরা এই ড্রইংরুমের সোফায় শুয়ে পড়বো। অন্ততঃ জন্মাষ্টমীর জন্য দুদিন। "

-" তার চেয়ে তুমি তিয়াস দিদিভাই এর সাথে শুয়ে পড়ো আমাদের ঘরে আর আমি শুয়ে পড়বো সোফায়।"

-" সে দেখা যাবে।"

-" আমি ভাবছি, ওই দুদিন এর জন্য রোবট ল্যারি আর রোবট বিমলাকে ভাড়া করে নেবো। সঙ্গে বিন্দিয়া তো আছেই। তাছাড়া, তিয়াস এসেছে শুনলে, এবার অনেক অতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আসবে। আমার বন্ধুরা, তোমার বান্ধবীরা, আত্মীয়রা। তাই ভাবছি, ক্যাটারিং সার্ভিস বলে দেবো।"

-" ঠিক বলেছো। আমিও এরকম ভাবছিলাম। খুব ভালো হবে।"

এরকম আলাপ আলোচনা পরিকল্পনায় কেটে গেলো পনেরো দিন। এসে গেলো জন্মাষ্টমী। জামাই জানালো, নাসার পাত্রও আসছে এবার তিয়াস কে দেখে, বিয়ে ফাইনাল করতে। দেখাশোনাটাও হবে ,শূর বাবুর বাড়িতে, জন্মাষ্টমীর পরের দিন।

দেখতে দেখতে এসে গেলো জন্মাষ্টমীর আগের দিন। মেয়ে জামাইতে ঘর গমগমে। গোপালের কেনাকাটা, পূজার যোগাড়, ঠাকুর মশাইয়ের আনাগোনায় হই হই ব্যাপার। সকালেই এসে গেছে রোবট ল্যারি ও রোবট বিমলা। গিন্নি অর্ডার দিয়ে দিয়েছে -" রোবো বিমলা তুমি রান্নার কাজে সাহায্য করবে। সেই সাথে খাবার পরিবেশনে থাকবে। "

-" জি ম্যাম। এখন কি করবো ?"

-" এখন সবাই কে চা দিয়ে যাও এক কাপ করে।" মেয়ে হুকুম করেদিলো।

-" জি ম্যাম।"

গিন্নি অর্ডার করলো, রোবো ল্যারি, স্যারের সঙ্গে বাজারে যাও। ফিরেএসে রুম ডেকর করবে, প্রিপ্যায়ার করবে রুমগুলো সব - গেস্টদের জন্য।"

-" ওকে ম্যাম।" বলেই ল্যারি বাজারের চার-পাচটা ব্যাগ হাতে নিয়ে নিলো। শূর বাবু রগড় দেখে মুখ চেপে হেসে নিলেন। তারপর, রোবো বিমলার দেওয়া চা খেয়ে চটি পড়লেন বাজারে যাবেন বলে। বাজারের লিস্ট ল্যারির

হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর, বাইক বার করলেন। ল্যারি এসে বাজারের ব্যাগ ও লিস্ট নিয়ে বাইকের পিছনে বসে গেলো। কিছু বলতেই হলো না। বাজারে পৌঁছে, ল্যারি জানালো, সে বাজারে ঢুকছে, স্যার কে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। সে লিফ্ট অপারেট করে, সব ফ্লোরে, গিয়ে গিয়ে বাজার কমপ্লিট করে আনতে পারবে। শূর বাবু ততক্ষন, মলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের চেয়ারে বসে রেস্ট নিন।

শূর বাবু রাজি হলেন। যদিও একটু ভয় থেকে গেলো, সব ঠিকঠাক আনবে তো! পূজা বলে কথা। ভুলভাল হলে, ঠাকুর মশাই আর গিন্নি আস্ত রাখবে না। সকালেই, ড্রাইভার রোবো সুরিন্দর কে শূর বাবু বলে দিয়েছেন, সকাল এগারোটায় ছাদে রাখা ঈগল হেলিকপ্টারটা নিয়ে, এয়ারপোর্ট পৌঁছে যেতে। দিদিভাইএর ফ্লাইট বোধহয়, বারোটায়। আর বলে দিয়েছিলেন, বার হবার আগে ,যেনো, হেলিকাপ্টারটা ভালো করে চেক করে নেয়। বাড়ি থেকে বার হবার সময় তো দেখছিলেন, চেক করছে। এখন সবে, এগারোটা। বোধহয় বার হয়ে গেছে।

-" চলুন,ফেরা যাক।" হাসি মুখে ল্যারি সব কেনাকাটা করে ফিরে এসে বললো। শূর বাবু উঠে পড়লেন।

বাড়ি ফিরে গিন্নি কে জিগ্গেস করলেন -"হ্যাগো, সুরিন্দর, হেলিকাপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ? বলে গিয়েছিলাম তো।"

-" হ্যাঁ গো।" হাসি মুখে গিন্নি জানালেন।

" তিয়াস ফোনে জানিয়েছে, ল্যান্ড করে গেছে ওরা।"

-" আচ্ছা, তুমি বাজার ভালো করে চেক করে নাও। " শূর বাবু হাতমুখ ধুয়ে পূজার জায়গাতে গিয়ে বসলেন।

মেয়ে খুব সুন্দরঠাকুর সাজাচ্ছে। বরাবর ওই সাজায়।

-"বাবা, শুনেছিলে তিয়াসের গানের প্রতিযোগিতার প্রোগ্রাম?"

-" না রে মা, আমি ওই সময় পার্কে থাকতাম। তবে তোর মায়ের কাছে রেগুলার খবর নিতাম। আর, আমি পার্কে গেলেই, আমার বন্ধুরা হৈ হৈ করে তিয়াস দিদির প্রশংসা করতো, তিয়াস ভারতের গর্ব বলতো, প্রোগ্রামটার কথা বলতো। আমি শুধু ফাইনালের দিনটা দেখলাম। পরশু। গর্বে বুক ভরে উঠছিলো, যখন, তিয়াস কে সেকেন্ড হওয়ার জন্য সিলভার "ফেতে দ্য লা মুসেক" ডিস্ক দেওয়া হলো।"

-" হ্যাঁ বাবা, একটুর জন্য গোল্ড পেলো না। বরাবর, ফার্স্ট হয়ে এলো ওই ব্যাটন ছেলেটা। আর ও সেকেন্ড।"

-"হোল ইউনিভার্সে সেকেন্ড হওয়া মুখের কথা না । যথেষ্ট গর্বের। ভারতের রাষ্ট্রপতি তো শুভেচ্ছা সহ ডিনারে তিয়াস কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শুনলাম।কম কথা !

- রোবো ল্যারি জানালো, গেস্ট রুম রেডি, সব রুমগুলোই রেডি। একবার চেক করে নিতে হবে। শূর বাবু চেক করার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন, জামাই স্নান সেরে এসে সবে দাঁড়িয়েছে, জামাই বললো, -"বাবা, আপনি বসুন, আমি চেক করে নিচ্ছি।"

একটু পরেই তিয়াস ঢুকে এলো বাড়িতে। “দাদু" চিৎকারে কাঁপিয়ে দিলো বাড়িটা। সঙ্গে, সেই ছেলেটা। কিছুটা অপ্রস্তুত, কিছুটা লজ্জিত ভাবে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে, সবার সাথে হ্যান্ডসেক করে নিলো। লালচে ফর্সা গাল যেনো আরো টমেটো লাল হয়ে উঠলো সবার সামনে। মুখে স্মিত হাসি, ঝকঝকে উজ্জ্বল দুটো চোখে ক্লান্তি। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে হাসি মুখে উঁকি ঝুঁকি চলতে লাগলো। শূর বাবু ছেলেটিকে ভিতরে আসতে অনুরোধ করলেন।

-" প্লিজ কাম।" মেয়ে জামাই ওদের দুজনকে ফ্রেস হয়ে নিতে বললো। জামাই ব্যাটনকে গেস্টরুম দেখিয়ে ঘোষনা করলো -" ইট ইস্ ইয়োর রুম ফর দিজ ডেইজ।"

ব্যাটন ঘরে ঢুকে বললো-" ওয়াও, সো নাইসলি ডেকরেটেড।" জামাই একটু হেসে ওকে এট্যাচ বাথরুম দেখিয়ে বাইরে চলে এলো। তিয়াস ও ব্যাটন দুজনেই ফ্রেস হতে গেলো প্রথমে।

ক্যাটারার এসে হাজির হয়ে গেলো। জামাই গেলো তাদের তদারকিতে।বাড়ি গমগম করতে লাগলো। সন্ধ্যা বেলায় পূজা। তখন, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই আসবেন। বিশাল হৈ হৈ ব্যাপার। পিছনের বাগানে, ডেকরেটর খাওয়ার জন্য প্যান্ডেল করে দিয়েছে, লাইটিং করছে। ঘরে ঘরে লাইটিং করে সাজানো হচ্ছে।

তিয়াসরা ফ্রেস হয়ে আসতেই, গিন্নি বললেন,-" দিদিভাই, সন্ধ্যা বেলায় প্রচুর লোক এ্যাটেন্ড করতে হবে। তাই, এখন চলো, সবার সাথে তোমরাও লাঞ্চ সেরে দুপুরটা

একটু রেস্ট নিয়ে নাও। আর বিকালে, মেক-আপের জন্য, পার্লারে কল করে নেবো কিনা বলো, কল করে দেবো।"

শূর বাবু বললেন -" দিদি, তুমি গিয়ে ব্যাটন কে সব বুঝিয়ে লাঞ্চের জন্য নিয়ে এসো বাগানে। আমরা ওখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।"

-" কিন্তু, ব্যাটন তো ভাত খেতে পারে না। ব্রেড আর ফিস খাবে।সঙ্গে স্যালাড। ওকে ধীরে ধীরে ভারতীয় খাবারে অভ্যস্ত করতে হবে।"

-" ঠিক আছে, তুই যা যা বললি, আমি তার সব ব্যবস্থা করে এখুনি রোবো বিমলাকে দিয়ে বাগানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই শুধু ওকে, সবার সাথে একসাথে খাবে বলে, খাওয়ার জায়গায় নিয়ে আয়। খাওয়ার জায়গায়,ব্যাটনের জন্য আলাদা লাঞ্চ প্লেট এলো। বীনস্, গাজর, পেঁপে সিদ্ধ, ডিম সিদ্ধ দিয়ে স্যালাড, বান রুটি, ইলিশ মাছ ভাজা, মিষ্টি দই, রসগোল্লা। প্রথম দিন সবার সাথে চুপচাপ এগুলোই খেলো ব্যাটন। কিন্তু, ওর নজর পুরোটা ছিল অন্যদের মেনুতে। "ওটা কি?- সুক্তো"?"- এটা কি? বেগুনী?" "ওয়ান পিস প্লিজ।" "রাইস উইথ পালস্ !"

- " লুকিং সো ডিফারেন্ট।"- "হোয়াট ইস দ্য নেম অফ দিস কারী ?" -" দোকা দাল না ?" -" প্লিজ গিভ মি ওয়ান পিস্, যাস্ট পর টেস্ট।" এইভাবে হৈহৈ করে সবার সাথে খেয়ে, ভাব করে ফেললো ব্যাটন, মুহূর্তে। দেখে মনে হচ্ছিল, দুবছরের বাচ্চা খেতে বসেছে। সবাই হাসতে হাসতে ভালোবেসে ফেললো ব্যাটন কে। সন্ধ্যায় জমিয়ে পূজাবাড়ি জমজমাট হয়ে উঠলো। আলোর

মালায় সেজে উঠলো বাড়ি। মাইকে চললো মন্ত্র উচ্চারণ।

গোপাল, সেজে গুজে বসে আছে ঝুলায়। সামনে সাজানো হরেক ভোগের থালা, গামলা, জাম বাটি। ব্যাটন অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলো। শূর বাবুর দায়িত্ব পড়েছে, ব্যাটন কে সব বোঝানোর। ব্যাটন শুনেছে , লর্ড কৃষ্ণের নাম। বাকি পুরোটা বোঝাতে হবে। খুব কঠিন কাজ। ওই কাজের দায়িত্বটা, তিয়াস দিদি, দাদুকেই দিয়েছে। দেখতে দেখতে ব্যাটন, দাদুর ভক্ত হয়ে উঠলো। এইবয়সে ভক্ত পেতে কার না ভালো লাগে ! শূর বাবুও খুব আনন্দ পেলেন ব্যাটন কে পেয়ে। পার্কের সব বন্ধুদের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন ব্যাটনের। পরদিন, ব্যাটনকে,পার্কে নিয়ে যাওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ব্যাটন, মহা উৎসাহে পার্কে যেতে রাজি হয়ে গেলো। আত্মীয় পাড়াপড়শীরা সবাই ভোগ খেয়ে চলে গেলো।

তিয়াস একটা প্লেটে দু-পিস ব্রেড আর ভেজ স্যুপ এক বাটি এনে, ব্যাটন কে দিলো। ব্যাটন, দাদুকে বলল,-" না দাদু, আমি এসব খাবো না। আমি আপনাদের মতন ভোগ খাবো।" ব্যাটন দাদুর পাশে বসে, বাচ্চা ছেলের মতন জিগ্গেস করতে করতে খেয়ে নিল - পোলাও-ওয়ান স্পুন, ভেজ কাটলেট ওয়ান পিস্, পনির কারী, ওয়ান পিস্ কচুরী, ওয়ান পিস্ আলুর দম, পাইন্যাপ্যাল চাটনী-ওয়ান স্পুন, ক্ষীর ফাইভ স্পুন, পাম পকোড়া সিক্স পিসেস্, লাড্ডু মিঠাই। সব চেয়ে মজার ঘটনা ঘটলো এই যে, ব্যাটন, পূজার যেমন সব ছবি তুলেছে মোবাইলে,তেমনি, ভোগেরও একটা একটা করে আলাদা

আলাদা ছবি তুলেছে মোবাইলের ক্যামেরায়। সব ভোগের নামও লিখে রেখেছে ছবির সাথে। দেখতে দেখতে কেটে গেলো পনেরোটা দিন। ব্যাটন, দাদুর সাথে রোজ পার্কে গিয়ে, ভাঁড়ে চা খেয়ে, দিম্মার হাতে লুচি, ছোলার ডাল খেয়ে, সারাদিন তিয়াসের সাথে কোলকাতা ঘুরে, সন্ধ্যা বেলায় বসে, দাদুর সাথে গল্প করে, বাংলা শিখে, রাতে ডিনারে, বেঙ্গলি ডিস খেয়ে কাটিয়ে দিলো পনেরোটা দিন। দাদুকে জানিয়ে ছিলো, ওর বাবা-মা নেই, অরফানেজে মানুষ। ওখানেই, নিজের ইচ্ছায় গানের প্রতি টান তৈরী হয়েছে। পরে, বড় হয়ে, গান শিখেছে নিজের রোজগারে। পরিবার কি, পরিবারে থাকার আনন্দ কি – এই এখন বুঝলো। আগে বোঝার ভাগ্য হয় নি। যাওয়ার সময় দেখলো, একটু ওজন বেড়ে গেছে আর রঙটা চেপে গেছে। মুখ ভার করে, বিদায় নিলো। এই ক'দিনে ছেলেটাকেও ভালোবেসে ফেলেছে সবাই। তাই, সবারই মন ভার। সবারই মায়া পড়ে গেছে।

আবার আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সবাই বিদায় দিলো। শূর বাবুর হেলিকপ্টারে তিয়াস সঙ্গে গিয়ে ব্যাটনকে এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিয়ে এলো। তিয়াসের মন খারাপ হয়ে থাকলো। জামাই বললো, নাসার পাত্র তিয়াস কে দেখতে আসতে চাইছে। তিয়াস পাত্রকে না দেখেই না করে দিলো। এই নিয়ে শুরু হলো অশান্তি। এর মধ্যেই শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ।

-" মা, শুনেছো, নাসার সেই পাত্রকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ওখানকার জেলে বন্দী।" -" ওমা, কেন রে ? কি করেছে ?"

-" আরে, শুনেছি, আমেরিকার সাথে কি বেইমানি করেছে, কোন্ গোপনতথ্য, প্রচুর টাকার অঙ্কে, ফাঁস করে দিয়েছে, আর সেই টাকায় মঙ্গলে জমি কিনে পালানোর ধান্ধা করেছিলো। যাওয়ার আগে, বিয়ে করে, তিয়াসকেও নিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিলো। "

-" কি সব্বোনাশ! তাহলে, তিয়াসদিদি বিয়ে করতে না চেয়ে ভালোই করেছে।" মা - মেয়ের ফোনালাপ শুনলেন শূর বাবু। তিয়াস কে ক' দিন ধরে একটু গম্ভীর লাগছে। বোধহয় এই জন্যই। পরদিন চলে গেলেন মেয়ের বাড়ি। তিয়াসকে দেখলেন, ছাদে একা বসে।

-" কি হয়েছে দিদিভাই ?"

-" ব্যাটনের কথা খুব মনে পড়ছে দাদু।"

-" হ্যাঁ, ছেলেটা খুব ভালো। কয়েক দিনেই সবার মন জয় করে নিয়েছে। ওকে একটা ফোন করে দাও না ?"

-"ওকে আমি আর ফোন করতে পারবো না। ও, নাসার ওই ছেলেটার কুকীর্তি ধরিয়ে দিয়েছে। আমার কাছ থেকে ওই ছেলেটার মোবাইল নম্বর পেয়ে ফোন করেছিলো। ভাব ও করেছিল। কিভাবে কি করে যেন বার করে ফেলেছে ছেলেটার কুকীর্তির পরিকল্পনা। আমাকে পৃথিবী থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে ,বুঝতে পেরে, ও আর স্থির থাকতে পারেনি। ও খবরটা, প্রমাণ সমেত আমেরিকা গভর্ণমেন্ট কে দিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার সরকারই, যাতে,ব্যাটনের কেউ ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য মোবাইল নম্বর পাল্টে ফেলতে বলেছেন। তাই, যত দিন না, ব্যাটন, নিজে ফোন করে

নম্বর দেবে, ততদিন আমি যোগাযোগ করতে পারবো না।"

-" সে কি রে! "

-" আরো একটা ব্যাপার আছে দাদু, কাউকে বলিনি। তোমাকেই বলছি। আমি কনসিভ করেছি। দুই মাস। ব্যাটনের সন্তান আমি ধারন করেছি।"

-" কি সব্বোনাশ! তাহলে এখন কি হবে! ব্যাটন জানে ?"
-" হ্যাঁ জানে দাদু। ও খুশি। আমি ভেবেছিলাম, এ্যাবোর করে নেবো। ও বারন করেছে। ও বলেছে, ও কোনদিন বাবাকে পায় নি। কিন্তু ও বাবা হবে- সেই স্বীকৃতি কেউ যেন না কেড়ে নেয়। "

-" তোর মা- বাবাকে তো জানাতে হবে রে।"

-" তোমরা জানাবে। তাই তো আমি তোমাকে জানালাম।"

-" দেখি আগে তোর দিম্মাকে বলি। ব্যাটন ছেলেটাকে তো আমাদের কারো অপছন্দ নয়, বোঝাতে ও রাজি করাতে অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।" ,

-" এখানে, দাদু নাতনিতে কি গোপন পরামর্শ হচ্ছে ?" জামাই এরগলার আওয়াজে চমকে উঠলো দুজনেই। -"

বাবা, নীচে চলুন। একটু চা খাবেন। আপনার মেয়ে বানিয়েছে। সঙ্গে গরমাগরম সিঙাড়া।"

সবাই নীচে নেমে এলো। চা খেতে খেতে বিশ্বযুদ্ধের গল্প চলতে লাগলো। এখন পশ্চিম গোলার্ধে হচ্ছে, কখন

বলতে কখন, পূর্ব গোলার্ধেও লেগে যাবে। প্রাণের কোন ঠিক ঠিকানা নেই।"

-" ঠিকই বলেছো জামাই। দিন দিন যা হচ্ছে।"

শূর বাবু বাড়ি ফিরে এসেও গম্ভীর হয়ে থাকলেন। জন্মাষ্টমীর ভিডিওটা চালালেন একান্তে। সন্ধ্যায় চা এর টেবিলে গিন্নি কে কাছে ডেকে সব বললেন। গিন্নি সব শুনে, বসে থাকলেন পাথর হয়ে। তারপর বললেন, - "ছেলেটা খারাপ নয়, একা তো, আমাদের ঘরের ছেলে হয়েই, আমাদের কাছে থাকবে। সব ঠিক আছে, আমি মেয়েকে বোঝাবো। শুধু ব্যাটন আবার যোগাযোগটা করলে হয়।"

পরদিন সকালে পার্কে গিয়ে শূর বাবু শুনলেন- পিলে চমকানো খবর- ইসলামগোষ্ঠী, পরমাণু বোমা ফেলেছে ফ্রান্সে। ফ্রান্স পুরোছারখার। কথা বলতে পারছেন না শূরবাবু। দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি এসে টেলিভিশন খুললেন।

গিন্নি জিগ্গেস করলেন-" কিহয়েছে ? হাঁফাচ্ছো কেন? সাত তাড়াতাড়ি টি ভি খুললে কেন ?"

টেলিভিশনের খবর দেখে কর্তা গিন্নী - দুজনের চোখ কপালে উঠলো। এ কি সর্বনাশ হলো !"

একটু পরেই মেয়ের ফোন এলো- -"মা , তিয়াস পাগলের মতন করছে। ওনাকি প্যারিস যাবে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না।"

গিন্নি, মেয়েকে বললেন -"আমরা আসছি।"

দুজনে গেলেন। তিয়াসের সব কথা বললেন মেয়ে জামাই কে। বোঝালেন। বড়হয়েছে, কিছু না বলতে। তারপর জামাই, দূতাবাসে যোগাযোগ করে, ব্যাটনের খবর নিতে লাগলো। কেটে গেলো দশ দিন। সারাপৃথিবী ছারখার হতে লাগলো হিংসার তান্ডবে। ভারত - পাকিস্তান যুদ্ধ চলতে লাগলো।

তিয়াসকে এরই মধ্যে ডক্টরস চেক-আপ করানো হলো। দশদিন পর, জামাই নিয়ে এলো ভয়ঙ্কর খবরটা- ব্যাটন প্যারিসের একটা হসপিটালে এতোদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পরমাণু বোমা পড়ার সময় সে একটা রেস্টুরেন্টে কফি খাচ্ছিলো।

তার গান থেমে গেল চিরকালের মতন। জামাই আর শূর বাবু ঠিক করলেন, যতদিন না বাচ্চাটা জন্মাচ্ছে, ততদিন খবরটা, তিয়াসকে দেওয়া যাবে না। সবাই সেটাই মেনে নিলো। দেখতে দেখতে কেটে গেলো আট মাস। ছেলে-বৌমারা ভারত ঘুরে গেল। ওদেরও সাবধান করে দেওয়া হয়েছিলো খবরটা বলতে।

তিয়াসকে বলা হলো, তোমার এই অবস্থা, কাউকে জানানো হবে না, তাই, তুমিও কারো সাথে যোগাযোগ রেখো না। রাস্তায় বার হয়ো না।

তিয়াস ঘরেই, সঙ্গীত চর্চা করেকাটিয়ে দিলো আট মাস।

হসপিটালের নার্স এসে জানালো -"সুসংবাদ। ছেলে হয়েছে। ছটফটে, শ্যামলা রং দারুন দেখতে।স্বয়ং যেন বালগোপাল।" তিয়াসের কোলে ছেলেটা তুলে দিতেই,

তিয়াস আদর করে, চুমু খেয়ে বলে উঠলো - তীরণ। তীরণের চিৎকারে সারা হসপিটাল গমগম করে উঠলো। তিয়াস জড়িয়ে ধরে বললো, "আমি তোকে অনাথ হতে দেবো না বাবা, কক্ষণো না, কোনদিন না।"

বার্থ সার্টিফিকেটে, তীরণের বাবার নাম লেখা হলো- জিন ব্যাটন। মা- তিয়াস ব্যাটন।

শূর বাবু সদ্যোজাত কে দেখে দুহাত জড়ো করে বলে উঠলেন -

"পরিত্রাণায় সাধূনাং

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ধর্ম সংস্থাপনার্থায়

সম্ভবন্তু প্রভো যুগে যুগে ।"